মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৫-১৬

আবুল বারকাত, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও জামালউদ্দিন আহমেদ
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ঢাকা: ৩ জুন ২০১৫

**লেখকত্রয় যথাক্রমে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি,
বর্তমান সভাপতি ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক**

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৫-১৬

১। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন দর্শন-রাজনৈতিক অর্থনীতি—বাজেট

সরকারের বার্ষিক বাজেট রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য পথনির্দেশক দলিল। এ কারণেই আসন্ন ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটের মর্মবস্তু সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য-বিশ্লেষণ-সুপারিশ উত্থাপনের আগে আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে গুরুত্ববহ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। উন্নয়ন দর্শনের বাস্তবায়ন অঙ্গ— বাজেট কোন অনড়-স্থির প্রক্রিয়া নয়, তা চলমান-গতিশীল একটি প্রক্রিয়া। আর তাই রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের নিরিখে বাজেটের চলমান-গতিশীল প্রক্রিয়ার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যসহ বিবর্তিত লক্ষ্যটি অনুধাবন অপরিহার্য।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ। এদেশে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। আজ থেকে ৪৪ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-উদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাদ্বয় বিগত ৪৪ বছরে তেমন বাস্তবায়ন হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তিন-চার বছরে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই আকাঙ্খার সোনার বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়। এসবই ঐতিহাসিক সত্য। গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারতো, যদি ১৯৭২-এর চার মূলস্তম্ভভিত্তিক সংবিধান বাস্তব রূপ নিতো, এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ কৃষিসহ বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় ব্যবস্থা চালু হতো তাহলে আজকের বাংলাদেশ আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় মোট দেশজ উৎপাদন ও মাথাপিছু উৎপাদনে অনেক বেশি এগিয়ে যেতো এবং সেইসাথে মানুষে-মানুষে বৈষম্যও হ্রাস পেতো। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তাইই নয়, সেই সাথে বহুমুখী ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের সেনাশাসন, স্বৈরশাসন, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি তোষণ-পোষণ— এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষণা বলছে "আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেনো চালকের আসনে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না— যারা অন্যের সম্পদ হরণ, লুণ্ঠন, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি— "রেন্ট-

সিকার" হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ করে ফেলেছে। এটাই ১৯৭৫ পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো দুরূহ হবে।"

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট হওয়া উচিত এমন যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণের সহায়ক হয়। সঙ্গত প্রশ্ন— ঐ বাজেটটি কোন বিষয়কে দার্শনিক ভিত্তি ধরে প্রণীত হবে? ঐ বাজেট হতে হবে আমাদের "স্বাধীনতার ঘোষণার" সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ; ঐ বাজেট হতে হবে আমাদের ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আর এসবের ভিত্তিতেই প্রণীত হতে হবে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা যার ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; আর ঐ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি বছর প্রণীত হতে হবে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের সরকারের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান অর্থাৎ বাজেট। সুতরাং বাজেট দলিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পথনির্দেশক দলিল হবে— এটাই স্বাভাবিক। যার বাস্তবায়ন না হলে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা বলা চলে তা হবে মুক্তি-স্বাধীনতার চেতনার সাথে বিরোধমূলক। এ অবস্থা আমাদের কোনো বাজেটেই কাম্য নয়।

আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। আমাদের সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল প্রণীত না হলে; সেই মোতাবেক পরিকল্পনা গৃহীত না হলে এবং বাজেট বিন্যস্ত না হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। নব্য উদারবাদী দর্শনের অধীনে মুক্ত বাজার ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাংলাদেশে এখন চালু হয়েছে তা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের চেতনা উদ্ভুত সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুক্ত বাজারের উন্নয়ন দর্শন আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে: বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বাড়ছে গুটি কয়েক সুপার ধনী। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস, কর্মসংস্থানের অভাব, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা— পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিসহ করছে। আইন-শৃংখলা সুস্থিত নয়। আইন-বিচার-সরকার-রাজনীতি বস্তুত রেন্ট-সিকার ক্ষমতাবানদের পক্ষে। দুঃশাসনের মাত্রাতিরিক্ততা সুশাসনকে কাগুজে বুলিতে রূপান্তরিত করছে। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে না গিয়ে আমরা চলেছি উল্টো পথে। এমন এক উন্নয়নের পথে যেখানে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন- উন্নয়ন কোন পথে? কার উন্নয়নের? জনগণের না'কি রেন্টসিকারদের? আর একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে যত কথা হয় তাতে প্রশ্ন জাগে "প্রবৃদ্ধির জন্যই প্রবৃদ্ধি"

দিয়ে কি হবে? জনগণের তাতে কি লাভ? না'কি গভীরভাবে ভাবা উচিত বৈষম্যহ্রাসকারী প্রবৃদ্ধির কথা?

'সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা'— এ মূলনীতির মাধ্যমে এক সমতাভিমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে এখনো বহাল আছে। সুতরাং, যৌক্তিক কারণেই সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে বৈষম্য নিরসনমুখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে এবং দারিদ্র্য সৃষ্টির সকল উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বাজেটে যাই লেখা থাকুক না কেনো রেন্টসিকিং উদ্ভুত দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতির কাঠামোতে সরকারি সেবা প্রকৃত বিচারে জনগণের কাছে কতটুকু পৌঁছায় তা এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ষোল কোটি মানুষের বাংলাদেশে **"দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন"** অর্থাৎ বৈষম্য হ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন দর্শনই হওয়া উচিত আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় দর্শন। কারণ, উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবে ঃ (১) অর্থনৈতিক সুযোগ, (২) সামাজিক সুবিধাদি, (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (৪) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও (৫) সুরক্ষার নিশ্চয়তা। মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনীতির গতি বাড়াতে হবে, আর অন্যদিকে গতি-উদ্ভুত প্রবৃদ্ধির ফল এমন পথ-পদ্ধতিতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস পায়। এজন্য প্রয়োজন মানবিক উন্নয়ন দর্শনের প্রতি আস্থা এবং এ দর্শন বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। আর এই প্রতিশ্রুতিই জাতীয় বাজেটে দৃশ্যমান হতে হবে।

দেশের অর্থনীতি ও সমাজের সুষ্ঠু অগ্রগতির লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ বাঞ্চনীয়। প্রকট ও ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য বিরাজমান থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈষম্য নিরসন, সকলের জন্য ন্যায্যভাবে সামাজিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ ও সুবণ্টিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান। সমাজ রূপান্তরের সকল প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনভিত্তিক হতে হবে। আগেই বলেছি এদেশে আমরা যেহেতু এ ধরনের একটি সামাজিক বিবর্তন কাঠামো তৈরী করতে পারিনি সেহেতু জাতীয় বাজেটেও তার প্রতিফলন দৃশ্যমান নয়। ফলে এ যাবতকাল যে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে তা কথার কথাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনা ও বাজেট মধ্যস্থতাকারী যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান তা সমাজে অনাকাঙ্খিত বিভাজন সৃষ্টি করছে যার ফলে দেশে দীর্ঘ মেয়াদে আরও বেশি ভারসাম্যহীন, আরও বেশি অস্থিতিশীল ও আরও বেশি বিশৃংখল পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা আদৌ অমূলক নয়।

২। অর্থনীতি ও সমাজে ভারসাম্যহীনতা– ধনী-দরিদ্র শ্রেণী বৈষম্য

গত ৪০ বছরে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম-শহরে শ্রেণী কাঠামো বদলে

দিয়েছে। একদিকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের দশা হয়েছে বেহাল, আর অন্যদিকে অঢেল বিত্ত-সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে গুটিকয়েক ধনীক শ্রেণীর হাতে। সরকারি পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি যাই বলুক না কেন, গবেষণা বলছে যে, আমাদের দেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের বহুমুখী মানদণ্ডে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষই দরিদ্র-বঞ্চিত (৬৬%), ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (৩১.৩%), আর অবশিষ্ট ৪১ লক্ষ মানুষ (২.৭%) ধনী। বিগত পঁচিশ বছরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়ন ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ।

ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য— বড় দুর্ভাবনার বিষয়। গ্রামে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা শহরের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৫ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে ৬০ শতাংশ খানা ভূমিহীন; ৫০ ভাগ খানায় বৈদ্যুৎ সংযোগ নেই; ৬০ ভাগ সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। আমাদের নগরায়ন আসলে "বস্তিয়ায়ন" অথবা "শহুরে জীবনের গ্রামায়ন"। নগরায়নের পাশাপাশি এখানে শিল্পায়ন হয়নি— যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দুর্দশা-বঞ্চনা-বিচ্ছন্নতা। গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্যের এ ধরনটি একদিকে মানুষকে আশাহত করে , মানুষের আত্মশক্তি-আত্মবিশ্বাস সঙ্কুচিত করে আর অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক উগ্রবাদের ভিত্তি দৃঢতর করে। বিগত ২৫ বছরে আমাদের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ অথচ দরিদ্র বিত্তহীন জনসংখ্যা বেড়েছে ৬৫ শতাংশ। বর্তমানে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত, ১ কোটি ৪৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং অবশিষ্ট ৪৭ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। বিগত ২৫ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশই দরিদ্র আর ১৭ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। একই সময়ে মধ্য-মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৫ লক্ষ। মধ্য-মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬১ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। বিগত ২৫ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ২৯ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্নবিত্তের বৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশ আর অতীতের নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী।

বিগত ৪০ বছরে আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে বহুমুখী দারিদ্র্য যেমন বেড়েছে তেমনি অঢেল বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে গুটি কয়েক ধনীর হাতে। ধনী গ্রুপে (উচ্চ শ্রেণী) এখন জনসংখ্যা হবে ৪১ লক্ষ। সম্পদ যে পুঞ্জীভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য বেড়েছে তার অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় ধনীর আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস: ২৫ বছর আগে মোট জনসংখ্যার ৩.৩ শতাংশ থেকে এখন ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যাস্বল্পদল সৃষ্টি হয়েছে যারা

"সুপার ধনী', এদের মধ্যে ১০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনীক শ্রেণীর মোট সম্পদের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা আসলে রেন্ট-সিকার— নিজেরা বিত্ত-সম্পদ সৃষ্টি করে ধনী হননি, ধনী হয়েছেন বিভিন্ন ধরনের লুণ্ঠন, দখল, বেদখল, জোর জবরদস্তি-মারপ্যাচের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনীক শ্রেণীর মানুষের হাতে। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক রেন্ট-সিকার ধনীদের হাতে অঢেল সম্পদ— এসবই বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে অনেক ধরনের জনকল্যাণ বিরোধী ধারা সৃষ্টিসহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

৩। অনর্থ অর্থনীতি জন্ম দিচ্ছে অর্থহীন সমাজ : সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি

আমাদের দেশে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে শুধুমাত্র এক অত্যুচ্চ ধনী রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীই সৃষ্টি হয়নি, পাশাপাশি অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি সাম্প্রদায়িকীকৃত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে "মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি", "সরকারের মধ্যে মৌলবাদের সরকার", আর "রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলবাদের রাষ্ট্র"। ধর্মের রাজনীতিকরণ অর্থনীতির রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ উপাদান এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রগতিবিমুখ ধারার যৌথক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে মৌলবাদের অর্থনীতি। দেশের মূল অর্থনীতির সব খাত-উপখাতে মৌলবাদের অর্থনীতি শক্তভাবে বিরাজমান। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় তথ্যসহ যা দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে এরকম: বাংলাদেশে ২০১৪ সালে মৌলবাদের অর্থনীতির নীট মুনাফা ২,৪৬৫ কোটি টাকা; দেশের মূল অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ হলে তা মৌলবাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৯-১০ শতাংশ; বিগত ৪০ বছরে মৌলবাদের অর্থনীতির পুঞ্জীভূত মোট নীট মুনাফার পরিমাণ হবে ৫ লাখ কোটি টাকারও বেশি; মৌলবাদের অর্থনীতির সদর্প বিচরণ সর্বক্ষেত্রে— আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যখাত, শিক্ষাখাত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, গণমাধ্যম তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারী সংস্থাসহ ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন জিহাদি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের অর্থনীতি নিরীহ ধার্মিক মানুষের ধর্মানুভূতি নিয়ে ব্যবসা করে এমনকি আপাত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানেও মুনাফা করে। তারা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উদ্ভূত নীট মুনাফার

একাংশ ব্যয় করে তাদের পক্ষে রাজনীতি করার জন্য কমপক্ষে ৫ লাখ পূর্ণকালীন রাজনৈতিক কর্মীকে বেতন-ভাতা প্রদান করে— এসবই তারা করে ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখল করার লক্ষ্যে ।

আমাদের চলমান অনর্থ অর্থনীতির আরো একটা মারাত্মক লক্ষণ হলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসহ মৌলবাদের অর্থনীতির সহায়তায় মূল ধারার জ্ঞান-শিক্ষার বিপরীতে পশ্চাৎমুখী ধর্ম শিক্ষার প্রসার । শিক্ষা এখন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকীকৃত । শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা ইতোমধ্যে এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের মধ্যে ১ জনই মাদ্রাসার ছাত্র । এসবই হলো ভবিষ্যতে ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বর্তমানে বিনিয়োগ । ধর্মভিত্তিক শক্তি তাদের লক্ষ্য অর্জনে শক্তিশালী ত্রিভুজের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে কাজ করে যে ত্রিভুজের মাথায় কর্পোরেট হেড অফিস হিসেবে আছে জামায়াত-ই-ইসলাম, আর নীচের এক বাহুতে আছে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত ১১৯টি সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠন আর অন্য বাহুতে আছে মৌলবাদের অর্থনীতি এবং বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসহ ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা ।

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রাদয়িকতা ও সংশ্লিষ্ট মৌলবাদ-জঙ্গিত্ব যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরুদ্ধ, সংবিধান বিরুদ্ধ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিরুদ্ধ সেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শন বিনির্মাতাদের অবশ্যই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে । এ ভাবনা সরকারের বার্ষিক বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে । বাজেটকে স্পষ্টভাবে সে পথনির্দেশ দিতে হবে যে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণবিমুখ অর্থনীতি ও রাজনীতি উচ্ছেদে আশু ও স্বল্পমেয়াদি "ক্ষতি হ্রাস কৌশল"সমূহ কি কি এবং একই সাথে দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের নীতি-কৌশলসমূহ কি এবং এসবে কোন খাতে ব্যয় বরাদ্দ কত হবে । আর এসব এড়িয়ে চললে "অনর্থ অর্থনীতি প্রগতিবিরুদ্ধ অর্থহীন সমাজ কাঠামোকে" উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করতেই থাকবে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ পরিপুষ্ট হতেই থাকবে যা এক সময় রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখলে উদ্যত হবে । সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ উদ্দিষ্ট বাজেটসহ সকল নীতি-নির্ধারণী দলিলপত্রে এ বিষয় যথাযথ গুরুত্বের সাথে স্থান পেতে হবে ।

৪ । বিশ্বায়ন ও নব্য-উদারবাদ : ভাবনা-দুর্ভাবনা

আমরা এখন এক "অন্যায্য" বিশ্বায়নের আওতায় । সাথে আছে বাজার অর্থনীতি আর বৈশ্বিক rent seeking ব্যবস্থা । নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ স্পষ্ট বলেছেন, "বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না, ...বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভন্ডামির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে" । আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন, "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক

বিভাজন সম্প্রসারিত করবে"। এ অবস্থায় আমাদের বাজেটকে বলতে হবে বিশ্বায়নের এ যুগে কিভাবে আমরা আমাদের ন্যায্য হিস্যা সর্ব্বোচ করতে পারি যা আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা দূরসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। একথা সত্য যে বিশ্বায়নের আওতায় বিশ্ববাণিজ্য, বৈশ্বিক সম্পদের চলাচল পারস্পরিক বিশ্ব-নির্ভরতাকে অনিবার্য করে তুলেছে। কিন্তু বিশ্বায়নের আওতায় বৈশ্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য যেমন ক্রমবর্দ্ধমান তেমনি জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায়ে টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব এক প্রস্তাবনা। শুধু তা-ই নয় প্রচলিত অন্যায্য এই বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বের দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে প্রতিবাদী আবহ, প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর, বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনসহ জঙ্গিবাদী তৎপরতা।

আজকের বিশ্বব্যবস্থার মূল ভিত্তি দর্শন— মুক্তবাণিজ্য, মুক্তবাজার মুক্তকর্ম প্রচেষ্টাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকোচনকারী "নব্য উদারবাদ" যৌক্তিক ব্যর্থতার কারণেই বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমালোচিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ১৯৯২ সালে লিখেছিলেন নব্য-উদারতাবাদই চিরস্থায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; বলেছিলেন অন্য কোনো ব্যবস্থা একে কোনো দিন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে হঠাতে পারবে না। তিনিও এখন এই ব্যবস্থার কড়া সমালোচক। আর অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ ২০১৩ সালে বলেই বসেছেন— বিশ্বায়ন কাজ করছে না; বিশ্বায়ন সৃষ্টি করছে বৈশ্বিক রেন্ট সিকারদের এক গোষ্ঠী; বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপি বৈষম্য বাড়াচ্ছে; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ত্ব আইন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি ইত্যাদি। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদদ্বয় জোসেফ স্টিগলিজ ও পল ক্রুগম্যান এবং সেইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের গুরু নোয়াম চমস্কি— সবাই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বলছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%"— এসব খুবই মারাত্মক "উন্নয়ন" প্রবণতা। এই ব্যবস্থায় বিশ্বের নেতৃত্ব ও সকল ক্ষমতা ও বিশ্বসম্পদের সিংহভাগ থাকছে উন্নত বিশ্বের হাতে আর জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ে একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাধর রেন্ট-সিকার শ্রেণির হাতে চলে যাচ্ছে রাষ্ট্রের, রাজনীতির ও অর্থনীতির সর্বময় কর্তৃত্ব। তারা হয়ে উঠছেন কতিপয়তন্ত্রে কর্তৃত্ববাদী আধিপত্যবাদী।

বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার ও মুক্ত বাণিজ্যের রথযাত্রায় আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ইতোমধ্যে উঁচুমাত্রায় পৌঁছে গেছে এবং তা ক্রমবর্দ্ধমান। উন্নয়নের এই পথ টেকসই নয়। বিরাজমান বৈষম্যবর্ধক প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সংঘাত বাড়বে, কমবে না। তাই উন্নয়ন দর্শনে মৌলিক সংস্কার জরুরি। আর এই সংস্কারের মূল মন্ত্র হবে বিরাজমান ও বিকাশমান অ-টেকসই বাস্তবতার বিপরীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে বৈষম্য-নিরসনমূখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে। অর্থনীতিতে এমন কোন নীতি গ্রহণ করা ঠিক হবে না যার সামাজিক অভিঘাত ঋণাত্মক। রেন্টসিকিং-দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের

অবসান ঘটিয়ে সরকারি সেবা সাধারণ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তথা সামাজিক বিবর্তনের সকল প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে বসাতে হবে যেখানে স্বদেশজাত আর মানবিক উন্নয়নই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়। এটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন দর্শন। বাজেটে এ উন্নয়ন দর্শনই প্রতিফলিত হতে হবে।

স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে নব্য উদারতাবাদের অন্ধ অনুসরণের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থাও জনকল্যাণকামী হচ্ছে না। এটা নব্য উদারবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। সরকারি বক্তৃতা-বক্তব্যে দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ স্বীকৃত হলেও সরকারি কর্মকাণ্ড মূলত রেন্টসিকিং গোষ্ঠীর আদেশ-নির্দেশে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকাঠামোর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। দেশে আইনের শাসনের অভাব দৃশ্যমান; 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' ক্রমবর্দ্ধমান; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সর্বত্র; স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অকার্যকর। কেন্দ্রীভূত সরকার চায় না স্থানীয় সরকার কার্যকর হোক, শক্তিশালী হোক অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ১১, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে "গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু"। আসন্ন বাজেটে উন্নয়নউদ্দিষ্ট এসব নিয়ে সুস্পষ্ট পথ নিদের্শনা থাকবে— এ আশা আমরা করতেই পারি।

নব্য-উদারবাদী প্রেসক্রিপশন অনুসরণে আমরা আজ যেখানে পৌঁছেছি তা সংঘাতময় পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী করার প্রাক-লক্ষণ। সামগ্রিক পরিবেশ যা তাতে প্রকৃত মানব উন্নয়নকামী, বৈষম্য হ্রাসকারী জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন সহজসাধ্য কাজ নয়। পিছিয়েপড়া মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বরাদ্দ নির্ধারণ করা হলেও তার সিংহভাগ মধ্যসত্ত্বভোগীরা হাতিয়ে নেয়। উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছে সামান্যই। অধিকাংশ সময়ে তারা জানেনই না তাদের জন্য বাজেটে কি বরাদ্দ আছে, কোন খাতে এবং কেন। আমরা আশা করবো আসন্ন বাজেটে এসব বাস্তব সমস্যার নির্মোহ বিশ্লেষণসহ উত্তরণের স্পষ্ট পথ নিদের্শনা থাকবে।

জনকল্যাণধর্মী জনঅংশীদারিত্বভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন তথা মানবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়ন এবং সাযুজ্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরি। যতদিন না তা ঘটে ততদিন গতানুগতিক বাজেট তৈরী হতে থাকবে এবং গতানুগতিক খন্ডিত আকারে এবং মূলত ক্ষমতাধর রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্তদের স্বার্থে তা বাস্তবায়িত হবে। আর পিছিয়েপড়া বিশাল জনগোষ্ঠী উপেক্ষিতই থেকে যাবে। আমরা এ অবস্থার পরিবর্তন আশা করি। এ আশা আমরা করি কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধের সাম্য ও অসাম্প্রদায়িক রূপকল্পে বিশ্বাসি। আর এ বিশ্বাস বাস্তবে রূপ দিতে পরিত্যাগ করতে হবে নব্য-উদারবাদী উন্নয়ন দর্শন, বাজারকে জনকল্যাণে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, শিল্পায়নসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা বাড়াতে হবে, অন্যায্য বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পর্যায়ের লড়াইয়ে সামিল হতে হবে।

৫। আসন্ন (প্রচলিত) বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের সুপারিশমালা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের প্রায় চার হাজার অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। অতীতে আমরা কখনও "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করিনি। এ যাবৎকাল সংস্কৃতিটাই ছিল এমন যে প্রতি বছর জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একবার বাজেট পেশ করবেন আর আমরা বাজেটের আগে কিছু বিশ্লেষণ-সুপারিশ করবো যার অধিকাংশই গৃহীত হবে না, আর বাজেটের পরে আর একবার হা-পিত্যেশ করবো। এবারো হয়তো তাইই হবে। তবে গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছি যে এ দেশের সকল অর্থনীতিবিদের পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব" প্রণয়ন ও তা জনসম্মুখে হাজির করা। এবারে আমরা সেই প্রয়াসটিই নিয়েছি। তবে যেহেতু আমাদের প্রস্তাবনা যথেষ্ট মাত্রায় মৌলিক ও ক্রিটিক্যাল সেহেতু আমরা আশা করছি না যে এ প্রস্তাব গৃহীত হবে। সে কারণেই আমাদের বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের আগে এক ধরনের সমঝোতার স্বার্থে আসন্ন চিরাচরিত বাজেটের জন্য কয়েকটি সুপারিশ উত্থাপন করছি। এসব সুপারিশ পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমাদের প্রস্তাবিত "বিকল্প বাজেটে"ও অন্তর্ভুক্ত আছে বলে ধরে নেয়া যায়। আসন্ন বাজেটের লক্ষ্যে আমাদের সুপারিশগুচ্ছ নিম্নরূপ:

৫.১ জাতীয় বাজেট— উন্নয়ন-এর দিকনির্দেশক দলিল। সে কারণেই চূড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট হতে হবে যে বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশল সংশ্লিষ্ট যে সব দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে তার ফলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির কোনটি কি মাত্রায় অর্জিত হবে : বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্রপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি; অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা; শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার; নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন; বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার; মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জন-সংখ্যাকে মানব-সম্পদে রূপান্তর; শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয় উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত; সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃত সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি; রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর; এবং রাষ্ট্রীয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন আন্দোলন।

৫.২ বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমুখী। তবে কাঠামোগত বিন্যাস যেন জনকল্যাণকামী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে কার্যকর

বাস্তবায়ন কৌশল শক্তিশালী করার দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিকে সমর্থন দেবার জন্য মুদ্রানীতি তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি কম রাখার চেষ্টা করতে হবে, তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এদিকে নজর রাখার প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি সংযত করবে নাকি সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতিকে সহায়তা দিতে সুদের হার কমিয়ে রেখে বৃদ্ধি করবে অর্থপ্রবাহ এই 'ট্রেড অফ' এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের কড়া নজরদারী রাখা উচিত এবং দ্রচত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। রাজস্ব নীতিকে লাগসই করতে হবে আশু।

৫.৩ বরাবরের মতোই বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মত এবং মানসম্মত বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন কার্যকারীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সূচারুভাবে প্রতিপালন করতে হবে-অন্যথা হলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকতে হবে। বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা, সমন্বয় ও পরীবিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির পথ নির্দেশ বাজেটে থাকতে হবে।

৫.৪ আসন্ন বাজেটে সামনের অর্থবছরের জন্য মোট প্রকৃত দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হবে হয়তো বা ৬.৫-৭.৫ শতাংশ। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় যে সব "অনুমান" উল্লেখ করা হবে তা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত পদক্ষেপসহ উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা বাড়ানো যায়।

৫.৫ আসন্ন বাজেটে বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি হয়তো বা ৭-৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব আসবে। এ প্রস্তাব শর্তাধীন বাস্তবায়নযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে বাজেট বিশ্লেষণ হলো: এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে এবং একই সাথে প্রতিবেশীদেশসহ আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য হ্রাসমান। সুতরাং, এ দিক থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে পারে। আর অন্যদিকে সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। শুধু সহায়ক মুদ্রানীতি নয়, সাথে সাথে অন্য কিছুও ভাবতে হবে-যে পথে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে, যে পথে অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং একই সাথে কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাবেন, এবং যে পথে বৈষম্য-হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। কৃষক যদি তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পান সেক্ষেত্রে ভোক্তা স্তরে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি হয় না, কিন্তু কৃষক তো সর্বস্বান্ত হন এবং কৃষক পর্যায়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়ে। এ ধাধার উত্তর বাজেটে থাকতে হবে। এ দেশে প্রকৃত কৃষক যদি

ভর্তুকিসহ অন্যান্য প্রণোদনা না পান সে ক্ষেত্রে অন্য কারো ভর্তুকি পাবার অধিকার নেই— এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করে বাজেটে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৫.৬ বর্তমান পদ্ধতিতে 'কস্ট প্রাইস'-এর ভিত্তিতে সম্পত্তির কর হার প্রয়োগ করা হচ্ছে যা নিতান্তই কম। প্রতি তিন বছর পরপর সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করা যেতে পারে। পূন:মূল্যায়িত সম্পদের উপর কর ধার্য করা উচিৎ। প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রত্যেক ৩-৫ বছর মেয়াদে প্রতিটি পৌর এলাকায় সম্পত্তির পূনঃমূল্যায়ণ করা হয়। সঠিকভাবে পূণঃমূল্যায়িত সম্পত্তির উপর সম্পদ কর হার প্রয়োগ করলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৫.৭ সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্ব-স্ব আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে মন্ত্রণালয়গুলো এই আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করে না। এ ক্ষেত্রে পাইলট ভিত্তিতে একটি মন্ত্রণালয়ে "আর্থিক বিবরণী মডেল" করে তা মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পরে বাকী ৩৮টি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে সব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরণী সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের "সংহত আর্থিক বিবরণী" প্রণয়ন করা যেতে পারে। আসন্ন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তুলনামূলক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিরবণী প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া প্রয়োজন। পরবর্তী বছরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে সময় বেঁধে দিয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৫.৮ দেশের পৌরসভাসমূহে আর্থিক ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নে মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যানসিয়াল রিপোর্টিং মডেল করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহেও অনুরূপ মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যানসিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন জরুরি। এ বিষয়ে রুলস্ অফ বিজনেস-এর বাস্তবায়ন দরকার।

৫.৯ কর প্রশাসনের আওতা জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নেয়া প্রয়োজন। তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগে এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা যোগ্য পরামর্শক সংস্থা নিয়োগ করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে "করদাতা শুমারী" সম্পন্ন জরুরি। সুনির্দিষ্ট টার্মস-অফ-রেফারেন্স-এর ভিত্তিতে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশে "করদাতা শুমারী" এবং "সম্পদ শুমারীর" কাজ সম্পাদন করে আগামী অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নে তা ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

৫.১০ আমরা গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের প্রতি সম্মান রেখে সরকারের আয়-ব্যয় সংশ্লিষ্ট 'ফিসক্যাল কর্মকর্তাদের" স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করে ঘুষ-নীতির বিলুপ্তির প্রস্তাব করছি।

৫.১১ অনুন্নয়নমূলক খরচ কমানো বিশেষ করে জনপ্রশাসনের ব্যয় কমানো, অপচয় কমানো ইত্যাদি সম্পর্কে বাজেটে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকে না। এসব বিষয় বাজেটে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।

৫.১২ সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় এ-দুটো খাতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশে প্রবল। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি লাগাতারভাবে বলে আসছে যে, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যেই নয়, সেইসাথে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রিতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যেও। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অবৈধ পথে- কালো পথে উৎপাদনশীল খাত থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছেন। আবার আমাদের এসব কথার অর্থ এই নয় যে আমরা ক্ষুদ্রায়তন সরকারের পক্ষে; আমরা কোন অর্থেই রাষ্ট্রকে নেহায়েত 'নৈশ প্রহরি' বানানোর পক্ষে নই। বাজেটে এ বিষয়টি স্পষ্টীকরণ জরুরি।

৫.১৩ সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় যৌক্তিকিকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া জরুরী বলে আমরা মনে করিঃ (ক) জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণ; (খ) ঢাকাসহ দেশের সকল সিটি করপোরেশনে 'সিটি গভর্নমেন্ট' গঠন এবং রাজউক (উত্তর ও দক্ষিণ), চ.উ.ক, বা.উ.ক, খু.উ.ক, এর মতো আলাদা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা; এবং (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজস্ব আহরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর/ফিস্ আহরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ।

৫.১৪ প্রতিরক্ষা খাতের 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে 'অদৃশ্যমান' ব্যয় হয়ে থাকে তা যেহেতু আমাদের জানার উপায় নেই তাই আমাদের পক্ষে প্রতিরক্ষা খাতে মোট সরকারি ব্যয় শুধু অনুমানই সম্ভব। আমরা মনে করি বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের স্ফীতি মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতিকে প্রকৃত বিচারে বিঘ্নিত করে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ইস্যুটিকে আমরা যেভাবে দেখি তা'হলো— প্রতিরক্ষা খাতে ক্রমবর্দ্ধমান সরকারি ব্যয়ের সাথে মানব উন্নয়ন ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে ব্যাপক মাত্রার দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ধীরগতি এবং সরকারি ব্যয়-বরাদ্দে ভারসাম্যহীনতার কারণে ধাপে ধাপে প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কোন

যৌক্তিকতা নেই। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে একথা আমরা বহুবছর ধরে বলে আসছি।

৫.১৫ বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম পথ অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ "ব্যবসা-ব্যয়" কমিয়ে আনা। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ বিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ হলো: শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাপ্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃংখলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল", বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধে সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসসহ দলিল-দস্তাবেজ সহজীকরণ, ব্যবসা-দ্রুতায়ন সংশ্লিষ্ট নীতিসহায়ক পদক্ষেপ ইত্যাদি।

৫.১৬ রপ্তানী-বাস্কেট বহুমুখীকরণ এবং সেই সাথে যারা উচ্চ-মূল্যের রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করবেন তাদের যুক্তিসিদ্ধ প্রণোদনা প্রদানের বিষয় বাজেট বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন।

৫.১৭ রপ্তানীর জন্য নতুন গন্তব্য দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

৫.১৮ পুঁজি বাজারে ধ্বসের পরে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ফিরে আসা এখনও দৃশ্যমান নয় এবং পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ২০১০ সালের পুঁজিবাজার ধ্বসের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কারসাজি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। পুঁজিবাজারের সমস্যা শুধু সরবরাহ ঘাটতিই নয় চাহিদা স্বল্পতাও। পুঁজিবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে আছে। তবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে সরকারি ও কর্পোরেট বন্ড মার্কেট সৃষ্টির কথা ভাবা প্রয়োজন। এর ফলে একদিকে স্টক বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমবে অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণে সক্ষম হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। বিষয়সমূহ বাজেটে উল্লেখ প্রয়োজন।

৫.১৯ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা মূলত ব্যাংক নির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেটের সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয়। অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের যৌক্তিক অর্থায়ন যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিকট অতীতে সংগঠিত ব্যাংকিং জালিয়াতিসমূহ আগ্রহী ব্যাংকারদের ঋণ প্রদানে অনুৎসাহী করছে আবার অন্যদিকে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের অভাবে এবং ঋণের উচ্চ সুদ হারের কারণে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যেও ঋণ গ্রহণের উৎসাহ কম। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারকে সম্মিলিত উদ্যোগে নীতি-কৌশল উদঘাটন করতে হবে। ব্যাংকিং শৃংখলা নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর মুদ্রানীতি ও ঋণনীতি হতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে উপযুক্ত রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবসায় সরকারি

বেসরকারি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়ার বাস্তবায়ন জরুরি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি লেনদেনে অটোমেশন চালু জরুরি। জাতীয় পেমেন্ট সিস্টেম অটোমেশন জরুরি।

৫.২০ ব্যাংক খাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বর্পূণ যে সব বিষয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা অতিতে সুপারিশ করেছি সেগুলি বাস্তবায়ন হয়নি বিধায় আসন্ন বাজেটে আবারো অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছি। সেগুলি হলঃ (ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্তত ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পুঁজিসম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হোক এবং প্রতিটি ব্যাংকে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সেল" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এ ঋণ হতে হবে চাহিদা-তাড়িত সরবরাহ-চালিত নয়। স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং সিস্টেমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। (খ) ৫০০ সর্বোচ্চ ঋণখেলাপী প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যক্তিবর্গের মোকাবেলার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হোক। (গ) সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি ঋণ-পুনঃবিন্যাসকরণ নিষিদ্ধ করা হোক। (ঘ) আর্থিক খাতের জন্য আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ করে দুর্নীতির মোকাবেলা করা হোক। (ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হোক।

৫.২১ কৃষিখাতের অর্জন ধরে রাখতে নিশ্চিত করা জরুরি যেন কৃষি ভর্তুকি হ্রাস না পায় এবং একই সাথে যেন ভর্তুকি-বৈষম্য হ্রাস পায়। সেই সাথে আমরা এও মনে করি যে প্রস্তাবিত বাজেট বছরেই কৃষি ও কৃষক ভাবনার যর্থাথতা বিচারে ১ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ বিঘা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব; আর পাশাপাশি ২০ হাজার জলাহীন প্রকৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ হাজার বিঘা, খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব। বিষয়টি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রদানসহ বাস্তবায়ন কৌশল সংশ্লিষ্ট পথনির্দেশনা প্রদান জরুরি।

৫.২২ জমি-জলা-জঙ্গল সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। দেশে ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা এখন জমি-জলাদস্যুদের বেদখলে। এসব খাস জমি-জলা দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য হিস্যা। তা কিভাবে দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরচষের মালিকানায় যাবে এ বিষয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে। এবারের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যথামাত্রায় গুরচত্ব দিতে হবে। যেমন ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টন, খাস জমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাস জলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গা চাষীর বর্গা স্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ক্ষুদ্র-কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট থাকতে হবে। আমরা মনে করি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে প্রস্তাবিত বাজেটে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে।

৫.২৩ যদিও বর্তমান সরকারের ২০০৯-১৩ নির্বাচনী ইশতেহারে 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো– কিন্তু গতবাজেটে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না। আমরা মনে করি আসন্ন বাজেটে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ স্থির করা প্রয়োজন।

৫.২৪ ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় ছাড়া প্রকৃতি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে আমাদের নিদিষ্ট সুপারিশ যে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিশেষত কৃষি সংশ্লিষ্ট উপখাতে পৃথক বরাদ্দ দেয়া উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশলগত কারণে আমরা মনে করি এ বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা।

৫.২৫ ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য "শস্য বীমা" "কৃষি বীমা", "জীবিকা বীমা", "প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা" ইত্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথ নিদের্শসহ ব্যয়-বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৫.২৬ দারিদ্র্য-পীড়িত ভৌগলিক এলাকা (চর-হাওর-বাওর-মঙ্গা)এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ (আইলা-সিডর-সাইক্লোন) এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদবিহীন স্বল্পমেয়াদি (৬মাস) ঋণ প্রদান দারিদ্র দূরীকরণে অন্যতম পন্থা হিসেবে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়টি এবারের চূড়ান্ত বাজেটে বিবেচিত হতে পারে; সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৫.২৭ কৃষি খাতের উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে; মধ্যসত্বভোগীদের কার্যক্রম স্থিমিত করবার জন্য সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ।

৫.২৮ দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন-ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য-বহুমুখীকরণ-এর দিক নিদের্শনা থাকতে হবে। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য শস্য-বীমা চালু করার কথা ভাবতে হবে।

৫.২৯ সকল TIN ধারীর (ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী) রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন করার প্রচলন যুক্তিযুক্ত হবে।

৫.৩০ দেশে এখন TIN ধারী মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখ, যাদের মধ্যে আনুমানিক ১০ লাখ মানুষ কর দেন (তাদের মধ্যে ৬-৭ লাখ সরকারি চাকুরে)। এ দেশে TIN ধারী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা হওয়া উচিত কমপক্ষে ৫০ লাখ, যাদের ৫০ শতাংশ নিম্নতম কর দেবার যোগ্য। বিষয়টি ভাবতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা আশা করি বিষয়টি বাজেটে যথাযোগ্য স্থান পাবে। সুপেয় পানি (খাওয়ার) ও স্যানিটেশন (স্বাস্থ্য সম্মত ল্যান্টিনসহ) উপখাতে বরাদ্দ গত অর্থবছরে আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতিয় লক্ষ্যমাত্রাসহ সংস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ খাতের বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বাড়াতে হবে।

৫.৩১ কর ব্যবস্থা যেন অব্যাহতি বহুল (exemption-ridden) না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ বলা জরুরি।

৫.৩২ এ দেশে মাত্র ৪৬ জন ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করেন। আমাদের হিসেবে বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর দেবার যোগ্য মানুষের সংখ্যা হবেন কমপক্ষে ৫০,০০০ জন। অর্থাৎ এ শ্রেণি থেকেই ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে বছরে কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। আর

এ অর্থ ব্যয় হতে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট খাতসমুহে। আমরা এ কথা আগেও বলেছি। এবারে আবারো আশা করবো বিষয়টি আসন্ন বাজেটে বিবেচনা করা হবে। এ উৎসটিও হতে পারে নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতুসহ যে কোনো বড় মাপের অবকাঠামো বিনির্মাণে অন্যতম সুদবিহীন উৎস।

৫.৩৩ এবারের বাজেটে সম্ভবত গতবারের ন্যায় অতি দরিদ্র বা হত দরিদ্রদের তালিকা প্রণয়নের কথা বলা হবে। মনে রাখা জরুরি যে, দারিদ্র্য হার হ্রাস নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই, কারণ দারিদ্র্য বহুমুখী। বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন ধরণের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রস্তাবিত এই "দারিদ্র্যের তথ্য ভান্ডারে" দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরণ ভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম ঠিকানাসহ অর্ন্তভুক্ত হতে হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারী প্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, ভৌগলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি। দারিদ্র্যের এ ধরণের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে চূড়ান্ত বাজেটে বরাদ্দসহ বাস্তবায়নের সময়-নির্দিষ্ট দিক নিদের্শনা থাকা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

৫.৩৪ এদেশে ক্রমবদ্ধর্মান মানব বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা ও বহুমুখী দারিদ্র্য নিরক্ষনে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জরুরি ভিত্তিতে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজনঃ (ক) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কিভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে। (খ) দারিদ্র্য নিরসন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (গ) দেশে প্রতিবছর যে ৩০ লাখ মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে তার মধ্যে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয় না। এসব বেকারের স্বকর্মসংস্থানসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি বাজেটে উল্লেখ করা হোক। সেই সাথে ক্রমবর্ধমান যুব বেকারদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কর্মসংস্থানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক। (ঘ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদ রক্ষা ও শ্রম-ভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনে বাজেটে উলেøখ করা হোক। (ঙ) ভূমিহীন কৃষক, কর্মচ্যুত শ্রমিক, বাস্তুচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারী প্রধান খানা (যার অধিকাংশই দরিদ্র), বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (এখন প্রায় ৮০ লাখ মানুষ), বস্তিবাসি, চরের মানুষ, ক্ষুদ্রজাতিসত্বার আদিবাসী মানুষ (২৫-৩০ লাখ), নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের (২৫-৩০ লাখ) মানুষসহ সকল প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রস্তাবনা বাজেটে উল্লেখ করা হোক।

৫.৩৫ এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুবিধা পাবার যোগ্য খানার সংখ্যা ২ কোটি যাদের ৭৫ শতাংশ এ সুবিধে বঞ্চিত। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এ খাতটি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সামগ্রিক বিচারে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ এবং পরিধি এখনও

তুলনামূলক কম। আমরা মনে করি জনকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে চূড়ান্ত বাজেটে এ খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি জরুরি। সেইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা-প্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এবং একই সাথে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন যেন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর "অর্ন্তভুক্তি ভ্রান্তি" দূর করা যায়। চূড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা জরুরি।

৫.৩৬ অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সুষম উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি।

৫.৩৭ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একদিকে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগত অধিকহারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি আর অন্যদিকে বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থাসহ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যয় প্রকৃত অর্থেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানালোকিত করে না। এদেশে এখন প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর একজন ধর্ম শিক্ষার আওতায়। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষাব্যবস্থাকে এহেন দুর্যোগের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে একুশ শতকের বিশ্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখানো এক ভ্রান্ত ধারণা বলে আমরা মনে করি। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করার প্রয়াসে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত করে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞান এখন সমার্থক নয়; শিক্ষা এখন "বিদ্যাবস্তু"। শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য সমাজ জীবনকে প্রগতি বিমুখ করছে। শুধু তাই নয় ১৯৭৫ পরবর্তী বিগত ৪০ বছরে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে এখন বাংলাদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন ছাত্র মাদ্রাসাগামী— এটা শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ ফল। এহেন অবৈজ্ঞানিক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য পুনরুৎপাদন করছে অন্যদিকে তা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট করছে। প্রবণতাটি মারাত্মক। আমরা আশা করছি আসন্ন বাজেটে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট উত্থাপিত বাস্তব বিষয়াদি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণসহ সমাধান-উদ্দিষ্ট পথ নির্দেশনা থাকবে।

৫.৩৮ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেইসাথে শিক্ষার স্তর ভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল ইত্যাদি, এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্নভাবে দেখানো উচিত। এ বরাদ্দের আন্তখাত অনুপাত মূল ধারার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যৌক্তিক করা হোক। তথ্য-যোগাযোগ-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই শুরু করা যৌক্তিক।

৫.৩৯ শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয়ই) আস্তে আস্তে জিডিপি-র ৮ শতাংশে উন্নিত করার লক্ষ্যে এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হোক।

৫.৪০ শিক্ষা বাজেটে অন্যান্য গতানুগতিক বরাদ্দের পাশাপাশি যে বিষয়ে ভাবনা নেই বললেই চলে সে বিষয়ে ভাবনা থাকতে হবে, থাকতে হবে যথেষ্ট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন কৌশলের পথ নির্দেশনা। নতুন ভাবনার বিষয়গুলি হবে এরকম: খেলার মাঠ, সাতার শেখার পুকুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুপুরের খাবার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, প্রযুক্তি ঘর।

৫.৪১ শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং মানের অবক্ষয় রোধের লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণের সুপারিশ করছি ঃ (ক) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একীভূত করার কর্মসূচী গ্রহণ; (খ) ক্যাডেট কলেজ ও পাবলিক স্কুল পরিচালনায় প্রদত্ত সরকারী ভর্তুকি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার এবং পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষা ধারাকে মূল ধারার সাথে একীভূত করা; (গ) নোট বই মুদ্রণ, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা এবং শাস্তির বিধান চালু করা; (ঘ) প্রাইভেট সেক্টরের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অমুনাফাজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; এবং (ঙ) কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা।

৫.৪২ সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমূখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধিতে জাতীয় বাজেটে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এ সবের পাশাপাশি বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের স্কুলমূখী করার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি খুবই যৌক্তিক হবে।

৫.৪৩ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২,০০০-৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘুর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার মোট ছাত্রসংখ্যার ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ -এ উন্নীত করা এবং অতি দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির পদক্ষেপ এ বছরের বাজেটে থাকতে হবে।

৫.৪৪ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কিন্তু এই বৃহৎ জনগোষ্ঠির উন্নয়নে তেমন কোন মৌলিক ও স্থায়ী পরিবর্তন এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় না। নারীর উন্নয়ন না হলে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন প্রশ্নবিদ্ধ থাকবেই। জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে নারীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াদি সুস্পষ্ট উল্লেখ পূর্বক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় একীভূত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ জাতীয় বাজেটে থাকতে হবে এবং লাগাতারভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এই প্রয়াসে দরিদ্র নারী ও শিশুর মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার জন্য জাতীয় বাজেটে তা অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। চাহিদাসমূহ হলো অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট-সহজবোধ্য বড় মাপের বরাদ্দসহ সময় নির্দিষ্ট পথ নিদের্শনা থাকতে হবে।

৫.৪৫ নারী-উদ্দিষ্ট (gender sensitive) কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা সবিস্তার উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য

হ'ল মহিলাদের কর্মসংস্থান, কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন (গার্মেন্টসসহ), মহিলাদের পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রায়ন, বিধবা ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, শিক্ষকদের ৬০% মহিলা, মহিলাদের নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধে, ডে কেয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা, ইত্যাদি ।

৫.৪৬ সকল শ্রেণির নারী উদ্যোক্তাদের অধিকার উৎসাহিত করার জন্য ঋণনীতির পরিবর্তন আনতে হবে । একই সঙ্গে স্বল্প সুদে অথবা বিনা সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

৫.৪৭ নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে গতানুগতিকতার বিপরীতে এবারের বাজেটে নারীর জন্য বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে বরাদ্দ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে ।

৫.৪৮ জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা থাকতে হবে । বাজেটে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা থাকতে হবে ।

৫.৪৯ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যখন উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সাথে তুলনা করছে তখন আমাদের দেশে এ খাত উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার সর্বনাশা প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হচ্ছে— রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা রাষ্ট্রের সহায়তায় । সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকে আশ্রয় নিচ্ছেন । আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প বরাদ্দ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচারণ ও জরাজীর্ণতার প্রতীক হয়ে আছে যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের সামিল । এ হেন অবস্থায় একবিংশ শতকে এখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শুধুমাত্র প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার কথা বললে হবে না, বলতে হবে দ্বিতীয় স্তরের উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবার কথা । আসন্ন বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা খাতের অগ্রাধিকার এবং বেসরকারি-প্রাইভেট স্বাস্থ্য খাতের যৌক্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে সুর্নিদিষ্ট পথ নির্দেশনা আমরা আশা করছি ।

৫.৫০ স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ কমপক্ষে ৫০% বৃদ্ধি করা হোক (উল্লেখ্য যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে যখন স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ১২ ডলার হওয়া উচিত তা আমাদের দেশে মাত্র ৩ ডলার) ।

৫.৫১ স্বাস্থ্য খাতে "দারিদ্র্যের রোগ" (diseases of poverty) নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ-প্রাধান্য দেয়া হোক যার অন্তর্ভুক্ত যক্ষা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, ডায়রিয়া, হাম, এবং আর্সেনিকোসিস । বিষয়টি জনস্বাস্থ্যের ভবিষতের জন্য গুরুত্বর্পূণ এ কারণে যে অনতিবিলম্বে দারিদ্র্যের রোগ হ্রাস করতে না পারলে ভবিষ্যতে সরকার ও পরিবার উভয়েই স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে ।

৫.৫২ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৫ (MDG-5) এ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন-এর কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৫৭৪ জন থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে/প্রসবে) নামিয়ে আনার কথা। সংশ্লিষ্ট এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৮৬ কোটি টাকা। কিন্তু মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ মাতৃমৃত্যু কাঙ্খিত মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন বছরে কমপক্ষে আনুমানিক ১,০০০ কোটি টাকা। সেজন্য আমাদের প্রস্তাব এখাতে এখনকার তুলনায় তিনগুণ বেশি বরাদ্দ দেয়া হোক।

৫.৫৩ আমাদের দেশে শিশুর জন্মের প্রথমদিন, জন্মের ৭ দিনের মধ্যে এবং জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যু হার অত্যুচ্চ। অথচ এই অতি-অকাল মৃত্যুরোধ শুধু সম্ভব তাই নয় স্বল্প ব্যয়েই সম্ভব। আর শিশুদের এ অতি-অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারলে ঐ শিশু সুস্থ-দীর্ঘজীবন পাবে। আমরা মনে করি স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট এ উপখাতে কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। এবং বরাদ্দের গন্তব্যস্থল হতে হবে প্রধানত জেলা শহরের হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতাল।

৫.৫৪ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত সম্পর্কে সাধারণ্যে যা ভাবা হয় অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় অসহনীয়। এদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার অনেক হলেও এসবের প্রকৃত মাত্রা ও অভিঘাত সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। তবে জানি যে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ তেমন নেই বললেই চলে। আর পাশাপাশি এসবে সমন্বয়হীনতার মাত্রা ক্ষমাহীন। আমাদের প্রস্তাব এ বারের বাজেটে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ কমপক্ষে ১০০০ কোটির টাকা করা হোক। একই সাথে ঐ বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর সমন্বয়ের পথ নির্দেশনা দেয়া হোক।

৫.৫৫ বাজেটে নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে: অশনাক্তকৃত নারী যক্ষ্মা রুগীর সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় বরাদ্দ ২ গুণ বাড়াতে হবে; ১০০ ভাগ নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টবরাদ্দ ৪গুণ বাড়াতে হবে; ক্রীড়া খাতে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ ৪গুণ বাড়াতে হবে; মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় বরাদ্দ (যে খাতে আলাদা বরাদ্দ নেই) ৩ গুণ বাড়াতে হবে; নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩০ গুণ বাড়াতে হবে।

৫.৫৬ বাংলাাদেশে কমপক্ষে ১০ শতাংশ মানুষ কোনো কোনো ধরনের প্রতিবন্ধীতার স্বীকার অথবা "ফিজিক্যালি আদারওয়াইজ এ্যবল"। এসব মানুষ নিয়ে কার্যকর ভাবনা নেই বললেই চলে। এসব মানুষদের ব্যাপক অংশ আনুপাতিক বেশি হারে দরিদ্র-স্বল্পবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাসিন্দা। আমাদের দেশের বাজেটে 'আদারওয়াজ এ্যবল' জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য বরাদ্দ নেই বললেই চলে। এ নিয়ে আমরা বিগত দশ-পনেরো বছর যাবৎ উচ্চকণ্ঠে বলে আসছি। খুব কাজ হয়নি। "আদারওয়াইজ এ্যবল" বা প্রতিবন্ধী এসব মানুষদের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে নির্দিষ্ট উপখাতভিত্তিক কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হোক এবং ঐ

বরাদ্দের ফল উদ্দিষ্ট মানুষেরা কিভাবে পাবেন সে বিষয়ে পথ-নির্দেশনা আমাদের মানবিক-নৈতিক দাবি।

৫.৫৭ গবেষণায় প্রমাণিত যে সিগারেট ও বিড়ির ক্ষেত্রে মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামো বাতিল করে উচ্চ সমহারে আবগারী শুল্ক আরোপ করা হলে প্রায় ৭০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক সিগারেট সেবনকারী এবং ৩৪ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক বিড়ি সেবনকারী ধূমপান ছেড়ে দেবেন। ৭১ লক্ষ তরুণ সিগারেট সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন এবং ৩৫ লক্ষ তরুণ বিড়ি সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। বর্তমান মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সিগারেটের কারণে ৬০ লক্ষ এবং বিড়ির কারণে ২৪ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। এছাড়াও, সরকার সিগারেট থেকে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা, বিড়ি থেকে ১,০০০ কোটি টাকা এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য থেকে ১,০০০ কোটি টাকা বাড়তি (অতিরিক্ত) রাজস্ব আহরণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আসন্ন বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো সিগারেটের ৪ স্তর বিশিষ্ট মূল্য স্তর বাতিল করে প্রতি ১০ শলাকার সিগারেটের উপর কমপক্ষে ৬০ টাকা আবগারী শুল্ক, প্রতি ২৫ শলাকার বিড়ির উপর ১৫ টাকা আবগারী শুল্ক, আর প্রতি ১০০ গ্রাম ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর ১৫০ টাকা আবগারী শুল্ক আরোপ করা হোক (যা তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষরকারী দেশ)। একই সাথে আমরা মনে করি যে বর্তমানে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর যে ১ শতাংশ হারে হেলথ সারচার্জ আছে তা বাড়িয়ে ২ শতাংশ করা উচিত। আহরিত হেলথ সারচার্জ থেকে কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করা সম্ভব। এ রাজস্ব আয় চারটি খাতে ব্যয় করা যেতে পারে : নিকোটিন আসক্তদের মুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক এবং তামাক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি, তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচার) এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

৫.৫৮ কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিশেষত: তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে বাজেটে আর্থিক নিদের্শনা থাকা জরুরি।

৫.৫৯ বিগত তিন অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। পরিবেশ বান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠির পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

৫.৬০ পরিবেশ দূষণকারীদের জন্য বিশেষ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

৫.৬১ নদ-নদীসহ বিভিন্ন জলাশয় অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাজেট কৌশল থাকতে হবে।

৫.৬২ গত তিনটি বাজেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন, দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। আমরা এসমস্ত কর্মসূচির অগ্রগতি জানানোসহ ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করছি।

৫.৬৩ ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহের কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে সনোফিল্টারের সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বাজেটে উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয় ।

৫.৬৪ নদীর নাব্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে নৌপথে মালামাল ও যাত্রি পরিবহন উভয়ই যথেষ্ট সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ।

৫.৬৫ প্রবাসী রেমিটেন্স নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রবাহের পরিমাণ বিভিন্ন সুত্রে বলা হয় প্রায় ৪ লক্ষ হাজার কোটি টাকা। রাজনৈতিক শ্লোগান কমিয়ে এ অর্থের ফলপ্রদ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ পদ্ধতি বের করা জরুরি। উপজেলা কুটির শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে শিল্প বাণিজ্য প্রক্রিয়া চালু করে এ অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব।

৫.৬৬ প্রবাসে কর্মরতদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৬৭ শিল্পায়নসহ অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎখাতের অবকাঠামো নির্মাণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক কম, তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অতি ব্যয় সাপেক্ষ এবং গ্যাস ভিত্তিক অনেক কম। যেহেতু গ্যাসের মজুত কম কয়লা ভিত্তিক বড় আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী। সরকার এ দিকে নজর দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আমাদের দেশে দুর্বল। ঘুর্ণিঝড় দুর্ঘটনাপ্রবণ বাংলাদেশে সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত ঝুঁকি বহুল। এ ক্ষেত্রে খরচ সাপেক্ষ হলেও জিএলএস সিস্টেম সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দীর্ঘ মেয়াদে সুফল বয়ে আনবে। সঞ্চালন ব্যবস্থা শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ ৩-৪ গুন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অপরদিকে আমদানীকৃত বিদ্যুৎও তুলনামূলক কম খরচ। কারণ এক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ না করে শুধু সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করে আমদানীকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। ইতোমধ্যে ভেড়ামারা সাব-ষ্টেশন নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন কমদামে বিদ্যুৎ আমদানী করে যথেষ্ট সাশ্রয় হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রীড লাইনের উন্নয়নকল্পে ব্যাপক বিনিয়োগে সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার আর্থিক ও কারিগরি প্রক্ষেপন অতীব জরুরি। একদিনে গ্রীড বিপর্যয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা এবং ফলে অর্থনীতির উপর প্রভাব নির্ণয় করা অপরিহার্য। এখাতে সামনের কয়েকবছর প্রতিবছর কমপক্ষে ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ জরুরি।

৫.৬৮ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠনের অবস্থা জানানো দরকার।

৫.৬৯ স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে "অর্থনৈতিক

অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পারে। এ পদক্ষেপ দেশে সামাজিক ও ভৌগলিক বৈষম্য ঘুচাতে সহায়ক হবে।

৫.৭০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; বিশেষ করে শিল্প পার্ক গড়ে তোলা দরকার। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।

৫.৭১ দেশে শিল্প অর্থায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি বাজেট বরাদ্দ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করা জরুরি। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড দেশে শিল্পায়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবর্তীণ পর্যাপ্ত করা জরুরি। স্বল্প মেয়াদী ঋণের বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জালে বন্দী হয়ে খেলাপী ঋণ বৃদ্ধি করছে; এটা রোধ করা দরকার।

৫.৭২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রচারমূলক খরচ চালায় ঐ মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং/অথবা মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল এবং/অথবা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। উদাহরণ স্বরূপ অর্থ মন্ত্রণালয় যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের ৮০-৯০ জন কর্মচারী ও ৫০-৬০টি গাড়ী সরকারী আমলাদের ঘুষের লেনদেন এবং বিলাসের ব্যবস্থায় নিয়োজিত। এ অপচর্চা-অন্যায় চর্চা ক্ষমতার অপব্যবহার এ ধরনের ব্যবস্থার প্রতিকূল যে কোন মানদন্ডে অমঙ্গলজনক তাই তা বন্ধ করা উচিত।

৫.৭৩ বিনিয়োগ বোর্ডের বর্তমান কাঠামো দেশের বিদ্যমান বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সার্বিকভাবে ব্যর্থ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমানিত। মধ্য আয়ের দেশ তো নয় বরং নিম্ন আয়ের দেশের চাহিদাও বর্তমান বিনিয়োগ বোর্ড দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। তাই বাস্তবতার নিরিখে অবিলম্বে ব্যাপক সংস্কার করা দরকার।

৫.৭৪ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা পূরণ করার নিমিত্তে বর্তমান আইএমএফ তাড়িত মুদ্রানীতি চালু আছে। বৈদেশিক মুদ্রা রির্জাভ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে, বিনিয়োগ বান্ধব মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ বান্ধব হওয়া দেশের স্বার্থে অতীব জরুরি বলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে।

৫.৭৫ চোরাচালান সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে আসন্ন বাজেটে যে সব বিষয়ে সুচিন্তিত নিদের্শনা থাকা জরচরি তা নিম্নরূপ: (ক) যেহেতু মার্চ মাসে ভারতীয় বাজেট ঘোষিত হয়, তাই ভারতের শুল্ক ও কর ব্যবস্থাকে আইটেম ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে যেসব আইটেম চোরাচালানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সেগুলোর উপর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শুল্ক এবং কর হ্রাস/বৃদ্ধি করে দামের পার্থক্য নিরসন করা হলে চোরাচালান কমে আসবে। এ উদ্দেশ্যে ট্যারিফ কমিশন এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট কোষ গঠনের ব্যবস্থা করা হোক। (খ) বাংলাদেশের আমদানীকৃত পণ্য ভারতে পাচার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে ঐ আইটেমগুলো চিহ্নিত করে ওগুলোর আমদানী শুল্ক যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নিত করা হোক।

৫.৭৬ ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যাপক কর-রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা এবং কর-নেটের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর-প্রশাসনের সংস্কারসহ বাজেটে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৫.৭৭ দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রপরিচালনায় দায়িত্বশীলদের রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, সংস্থার সাথে লেনদেন নিষিদ্ধ করতে হবে। এ নীতি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করতে হবে।

৫.৭৮ কালো টাকা অথবা মার্জিত ভাষায় অপ্রদর্শিত আয়ের বিষয়টি স্পর্শকাতর। আমাদের মতে এ দেশে পুঞ্জীভূত কালো টাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৫ লাখ কোটি থেকে ৭ লাখ কোটি টাকা (অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে জিডিপি-র ৪২%–৮০%)। বিষয়টি বাস্তব সত্য। এ অর্থ উদ্ধার প্রয়োজন। একদিকে এমন কোনো পথ-পদ্ধতি অবলম্বণ করা উচিত হবে না যার ফলে সৎ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অসৎ হতে প্রণোদিত হতে পারেন। অন্যদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে কালো টাকা সংশ্লিষ্ট "সিজর ইফেক্ট" কিভাবে সমাধান করা যায় বিষয়টি বাজেটে থাকা জরুরি। এ বিষয়ে সরকার একদিকে যেমন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেন, অন্যদিকে একটি কার্যকর কমিশন গঠন করতে পারেন। আমরা আশা করবো চূড়ান্ত বাজেটে এ কমিশনসহ শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা থাকবে।

৫.৭৯ মুক্তবাজার ও অসম বিশ্বায়নের তোড়ে জাতীয় অর্থনীতি রক্ষার জন্য আমদানীমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হোক।

৫.৮০ গত বছরের বাজেটে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আর্থিক বরাদ্দের উল্লেখ ছিল না। আমরা মনে করি এবারের বাজেটে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা জরুরী।

৫.৮১ কৃতি গবেষকরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রণোদনার বিষয়টি এবারের বাজেটে যথামাত্রা গুরুত্বের সাথে থাকা উচিত ।

৫.৮২ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রাক-বাজেট পর্যালোচনায় সরকারের কাছে কর ও অন্যান্য সুবিধা দাবী করে থাকে। এবছরও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে এ সমস্ত যুক্তি বা দাবী যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

৫.৮৩ বাজেটে অন্তর্ভুক্তি যোগ্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ বিষয় আমরা বেশ কয়েকবছর ধরে বলছি কিন্তু তেমন কাজ হচ্ছে না। বিষয়গুলি আবারও এবারের বাজেটে এবং জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার জন্য উপস্থাপন করছি। বিষয়গুলি নিম্নরূপ: (ক) জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণার অন্তত ছয়মাস আগে বাজেটের মূল বিষয়াদি (প্রধান ব্যয়খাত অনুযায়ী অনুমিত/সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ, উৎস অনুযায়ী সম্ভাব্য আয়, ইত্যাদি) প্রকাশ করা উচিত। (খ) উন্নয়ন বাজেটে অর্থবছরের

মাঝখানে অননুমোদিত কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা। (গ) সকল ধরনের দুর্নীতি, দুর্নীতির উৎস ও দুর্নীতি নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। (ঘ) বছরের ১ জানুয়ারী কিংবা ১ এপ্রিল থেকে অর্থ-বছর গণনা করা হোক।

৬। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০১৫-১৬

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অতীতে কখনও "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করে নি। এবার আমরা এ ধরণের একটি প্রয়াস নিয়েছি যার শিরোণাম "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৫-১৬"। আমাদের এই প্রয়াসের হিসেব পদ্ধতি ও অনুসিদ্ধান্তসহ ফলাফলসমূহ দেশবাসীসহ জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি। যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ইতিহাসে এইই প্রথমবারের মত আমরা "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাবনা হাজির করছি সেহেতু বৈশিষ্ট্যসূচক মূল বিষয়সমূহ উল্লেখ জরুরি। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে মৌলিক এবং গতানুগতিক নয় বিধায় আপাত গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আমাদের প্রস্তাবিত "বিকল্প বাজেট" রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শগত কারণেও বিদ্যমান নীতি-নির্ধারকদের কাছে বাতিলযোগ্য মনে হতে পারে। কারণ আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে "মুক্তবাজার-মুক্তবাণিজ্য-মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা" ভিত্তিক নব্য-উদারবাদী মতবাদ (যা সাম্রাজ্যবাদসহ বিদেশী দাতা গোষ্ঠী আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে) বাতিল ঘোষণাপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাউদ্ভূত আমাদের সংবিধানের বিধি মোতাবেক সংবিধানের চার মৌল স্তম্ভভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও অসাম্প্রদায়িক মনন-মানসকাঠামো বিনির্মাণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তত্ত্ব কাঠামো গ্রহণ করেছি। বাজেটসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশ থেকে ধার করা নয় অথবা আমাদের উপর বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেয়া নয় "দেশজ মাটি উত্থিত দর্শন"ই সঠিক পথ বলে বিবেচনা করি। আমরা এ বিষয়েও সচেতন যে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো এবং নীতি-নির্ধারণে শ্রেণি স্বার্থ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে প্রণিত বাজেট-দর্শন গ্রহণে বাধা হবে। এত কিছুর পরেও আমরা "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করছি নিদেনপক্ষে এ কারণেও যে আমরা বুঝাতে চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব– যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক যে কোন নিরিখেই তা সম্ভব; সম্ভব এ দেশের দ্রুত উন্নয়ন;

সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীনা সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানব; সমাজ সৃষ্টি ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হল সেসবের ভিত্তিতে "বিকল্প বাজেট" প্রণয়নের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যে সকল বিষয়ে আমরা বিশেষ জোর দেবার ও অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভেবেছি সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) বাজেট প্রণয়নে আমরা সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছি । প্রচলিত বাজেটে যা কিছু সংবিধানের সাথে সাযুজ্যহীন অথবা অসংগতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক এ ধরনের সবকিছু আমরা বর্জন করেছি [যা সংবিধানের ৭(১) ও ৭(২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ] ।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী ফর্দের বিপরিতে রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয়বরাদ্দ নির্ণয় করছি । অন্যান্যের মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ বেশি ধরা হয়েছে ।

(গ) বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যেসব খাত দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, যেসব খাতের বরাদ্দে সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক, যেসব খাতের বরাদ্দ দেশজ শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ।

(ঘ) বাজেটের আয় ও ব্যয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেছি ।

(ঙ) কোন ধরণের বৈদেশিক ঋণ ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে ।

(চ) রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর (অর্থাৎ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত–নিম্নমধ্যবিত্ত) তুলনায় বিত্তবান-ধনীদের উপর যৌক্তিক কারণেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে ।

(ছ) ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি এবং/অথবা প্রতিষ্ঠান যারা সঠিক কর প্রদান করেন না তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন তা বিবেচনা করা হয়েছে । একই সাথে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন করহার নির্ধারণ করা হয়েছে ।

(জ) পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্তদের উপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে ফলে তা দারিদ্র্য-বৈষম্য

হ্রাস করে না। সে কারণে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

(ঝ) বাজেটের প্রতিটি আয় খাত ও সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে প্রতিটি খাত-উপখাতে সম্ভাব্য অধিক পরিমাণ আয় নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া হয়েছে।

(ঞ) কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা হয়েছে যেসব খাত থেকে কোন আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সাথে সেসব খাত চিহ্নিত করা হয়েছে যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক যদি একটু উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালি করা যায়।

(ট) উন্নয়ন দর্শনের কারণে বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, শিল্প, কৃষি, নারী ও শিশু, মুক্তিযোদ্ধা, ভতুর্কি ইত্যাদি খাতসমূহে। আর অনুৎপাদনশীল ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঠ) মানব উন্নয়ন ও মানব সম্পদ-উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাদূরসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (কৃষকের শস্য বীমা ও ভূমি সংস্কার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম)-র ব্যয় খাতের বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

(ড) আমদানি শুল্কহার নির্দ্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ দর্শন প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ঢ) উল্লিখিত সব কিছু বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত যে হিসাব দাঁড়িয়েছে সেখানে আমাদের বিকল্প বাজেটে আয় ও ব্যয় বরাদ্দ-এর পরিমাণ হবে সরকার সম্ভাব্য যে পরিমাণ (অর্থ) প্রস্তাব করতে যাচ্ছে তার তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। তবে নির্দিষ্ট অনেক খাত-উপখাতে তা বহুগুণ বেশি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে উল্লেখিত পদ্ধতিগত বিষয়াদিসহ অনুসিদ্ধান্ত সমূহের প্রয়োগে আমরা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করছি তার মোট আকার (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা– যা মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সম্ভাব্য প্রস্তাবের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী।

আমাদের প্রস্তাবিত ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বাজেটের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্টগুলো হবে নিম্নরূপ: (১) সরকারের রাজস্ব আয় থেকে আসবে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বাজেট বরাদ্দের ৭৭ শতাংশের যোগান দেবে সরকারের রাজস্ব আয়।

আর বাজেটের বাকী ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ঘাটতি অর্থায়নের যোগান দেবে সম্মিলিতভাবে বিদেশে বসবাসকারী দেশীয় নাগরিকদের বন্ড (মোট ৪৫ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি অর্থের ৩১ শতাংশ), সরকারি-বেসরকারী যৌথ অংশীদারিত্ব (মোট ৪৫ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি আয়ের ৩১ শতাংশ), দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ (মোট ৩০ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি আয়ের ২১ শতাংশ), এবং সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ (মোট ২৫ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি আয়ের ১৭ শতাংশ); (২) বাজেট অর্থয়ানে কোন বৈদেশিক ঋণ লাগবে না; (৩) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কাঠামোতো গুণগত রূপান্তর ঘটবে। মোট বরাদ্দ ও আনুপাতিক বরাদ্দে উন্নয়ন বাজেট হবে অনুন্নয়ন বাজেটের চেয়ে অনেক বেশী যা এখন ঠিক উল্টো। এখন উন্নয়ন-অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত ৩১:৬৯, যা আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে হবে ৬৫:৩৫। উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৮৩০ কোটি টাকায় উন্নিত হবে, আর অনুন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি পাবে ১.৭৩ গুণ। (৪) বাজেটের আয় কাঠামোতে মৌলিক গুণগত রূপান্তর ঘটবে। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) হবে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৪৩ শতাংশ হবে প্রত্যক্ষ কর এবং ৫৭ শতাংশ হবে পরোক্ষ কর। কাঠামোগত এ পরিবর্তনটি মৌলিক। কারণ গত অর্থবছরের বাজেটের আয়ে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের অনুপাত ছিল ৩৪ শতাংশ ও ৬৬ শতাংশ । অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের আয় কাঠামোতে বিত্তশালী ও ধনীদের উপর করের বোঝা অতীতের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে যা সমাজে ধন বৈষম্য হ্রাস করবে (এসবই সারণি ১ ও ২-এ দেখানো হয়েছে)।

বাজেটে আয়ের যে উৎস দেখানো হয় তা প্রধানত দু'টি বৃহৎ বর্গে বিভক্ত : (১) কর থেকে প্রাপ্তি ও (২) কর ব্যতীত প্রাপ্তি। আর কর থেকে প্রাপ্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর, (২) মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর থেকে প্রাপ্তি, জাতীয় রাজস্ব র্বোড বহির্ভূত কর থেকে প্রাপ্তি, এবং কর ব্যতীতে প্রাপ্তির অংশ ছিল যথাক্রমে ৮১.৮ শতাংশ, ৩.১ শতাংশ ও ১৫.১ শতাংশ। আমাদের প্রস্তাবনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ সব অনুপাত ন্যয্যমুখী হয়ে শতকরা হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭৫.৩ শতাংশ (৮১.৮ শতাংশের পরিবর্তে), ৫.৫ শতাংশ (৩.১ শতাংশের পরিবর্তে) এবং ১৯.২ শতাংশ (১৫.১ শতাংশের পরিবর্তে)। অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বৈষম্য-অসমতা নিরসনমুখী বাজেটনীতির কারণে আমাদের প্রস্তাবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় প্রত্যক্ষ করসমূহ, যেমন আয় ও মুনাফার আয় কর ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে, লভ্যাংশ ও মুনাফা থেকে প্রাপ্তি ৬ গুণ বৃদ্ধি পাবে, সুদ থেকে প্রাপ্তি প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পাবে। শুধু এই তিন উৎস থেকে পাওয়া যাবে মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৪২ শতাংশ (২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে এ তিন উৎস থেকে প্রাপ্তি ছিল আনুমানিক ৩৪ শতাংশ)।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য আমরা মোট ১৩টি নতুন উৎস নির্দেশ করেছি যা অতিতে ছিল না। সরকারি আয় বৃদ্ধির নতুন এসব উৎসের মধ্যে থাকবে বিদেশী নাগরিকদের উপর কর, সেবা থেকে প্রাপ্তি কর, সম্পদ কর, বিমান পরিবহন ও ভ্রমনকর, ভ্রমন কর, তার ও টেলিফোন বোর্ড, টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন, এনার্জি রেগুরেটরী কমিশন, ইন্সুরেন্স রেগুলেটরী কমিশন, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিআইডাব্লিউটিএ, সরকারি স্টেশনারী বিক্রয় এবং পৌর হোল্ডিং কর। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নতুন এসব উৎস থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হবে ৪৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা মোট রাজস্ব আয়ের ৯.৩ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য যে রাজস্ব আয়ের নতুন এসব উৎসের মধ্যে মাত্র একটি উৎস– "সম্পদ কর" থেকেই সরকার ২৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে পারেন।

সারণি ১: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে আয়ের বাজেট

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৪-১৫: সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট*		২০১৫-১৬: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব		অর্থনীতি সমিতির ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের জন্য প্রস্তাবিত অয়ের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কতগুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	করসমূহ হইতে প্রাপ্তি					
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ					
১০০	আয় ও মুনাফার উপর কর	৫৬,০৮৬	৩০.৬৬	১৬৮,২৫৮	৩৪.৫১	৩.০০
৩০০	মূল্য সংযোজন কর	৫৫,০১৩	৩০.০৭	১১০,০০০	২২.৫৬	২.০০
৪০০	আমদানি শুল্ক	১৪,৫৯০	৭.৯৭	২০,০০০	৪.১০	১.৩৭
৫০০	রপ্তানি শুল্ক	৩৩	০.০২	৫০০	০.১০	১৫.১৫
৬০০	আবগারী শুল্ক	১,২৫১	০.৬৮	৫,০০০	১.০৩	৪.০০
৭০০	সম্পূরক কর	২১,৩৩৪	১১.৬৬	২৫,০০০	৫.১৩	১.১৭
	বিদেশি নাগরিকদের উপর কর			২,৫০০	০.৫১	
	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর			৪,০০০	০.৮২	
	সম্পদ কর			২৫,০০০	৫.১৩	
	বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর			৩,৫০০	০.৭২	
৯০০	অন্যান্য কর ও শুল্ক	১,৪১৩	০.৭৭	৫,০০০	১.০৩	৩.৫৪
	মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	**১৪৯,৭২০**	৮১.৮৩	**৩৬৮,৭৫৮**	৭৫.৬৪	২.৪৬
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত কর সমূহ					
১০০০	মাদক শুল্ক	৭৭	০.০৪	৫,০০০	১.০৩	৬৪.৯৪
১১০০	যানবাহন কর	১,২৪৮	০.৬৮	১০,০০০	২.০৫	৮.০১
১২০০	ভূমি রাজস্ব	৭৩৮	০.৪০	৫,০০০	১.০৩	৬.৭৮
১৩০০	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	**৩,৫০৯**	১.৯২	৫,০০০	১.০৩	১.৪২
	ভ্রমণ কর	০	০.০০	২,০০০	০.৪১	০
	মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত করসমূহ	**৫,৫৭২**	**৩.০৫**	**২৭,০০০**	৫.৫৪	৫
	মোট করসমূহ হইতে প্রাপ্তি	**১৫৫,২৯২**	**৮৪.৮৮**	৩৯৫,৭৫৮	৮১.১৮	৩
	কর ব্যতীত প্রাপ্তি					
১৫০০	লভ্যাংশ ও মুনাফা	৪,৯৩২	২.৭০	৩০,০০০	৬.১৫	৬.০৮
১৬০০	সুদ	৭২৭	০.৪০	৫,০০০	১.০৩	৬.৮৮
১৭০০	রয়্যালটি এবং সম্পদ হইতে আয়	৪২	০.০২	২০০	০.০৪	৪.৭৬
১৮০০	প্রশাসনিক ফি	৪,৫০১	২.৪৬	৫,০০০	১.০৩	১.১১
১৯০০	জরিমানা, দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৪৫৮	০.২৫	৮,০০০	১.৬৪	১৭.৪৭
২০০০	সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৪৯৫	০.২৭	২,৫০০	০.৫১	৫.০৫
২১০০	ভাড়া ও ইজারা	১৫৯	০.০৯	৩,৫০০	০.৭২	২২.০১
২২০০	টোল ও লেভী	৪৯৫	০.২৭	২,০০০	০.৪১	৪.০৪
২৩০০	অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৩৮৯	০.২১	২,০০০	০.৪১	৫.১৪
২৪০০	সেচ বাবদ প্রাপ্তি ***	১৩	০.০১	৪২	০.০১	৩.২৩
২৫০০	প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	২,৫৩৯	১.৩৯	৫,০০০	১.০৩	১.৯৭
২৬০০	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১১,৪৬৫	৬.২৭	১৫,০০০	৩.০৮	১.৩১
৩১০০	রেলপথ	১,১০০	০.৬০	৩,৫০০	০.৭২	৩.১৮
৩২০০	ডাক বিভাগ	২৯৪	০.১৬	৫০০	০.১০	১.৭০
৩৬০০	সরকারের সম্পদ বিক্রয়	৬৬	০.০৪	২৫০০	০.৫১	৩৭.৮৮

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৪-১৫: সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট*		২০১৫-১৬: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব		অর্থনীতি সমিতির ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের জন্য প্রস্তাবিত অয়ের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কতগুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	(স্টেশনারীসহ)					
	তার ও টেলিফোন বোর্ড			১,৫০০	০.৩১	
	টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন			২,৫০০	০.৫১	
	এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন			৫,০০	০.০০	
	ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরী কমিশন			৫০০	০.১০	
	সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন			৫০০	০.১০	
	বিআইডাব্লিউটিএ			৫০০	০.১০	
	পৌর হোল্ডিং কর			১,৫০০	০.৩১	
	মোট কর ব্যতীত প্রাপ্তি	**২৭,৬৬২**	**১৫.১২**	**৯১,৭৪২**	১৮.৮২	৩.৩২
	মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	১৮২.৯৫৪**	**১০০.০০**	**৪৮৭,৫০০**	১০০.০০	২.৬৬
	ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ					
	বিদেশে বসবাসকারী দেশীয় নাগরিকদের বণ্ড			**৪৫,০০০**		
	সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব			**৪৫,০০০**		
	ঋণ গ্রহণ (দেশীয় ব্যাংক হতে)			**৩০,০০০**		
	ঋণ গ্রহণ (সঞ্চয় পত্র থেকে)			**২৫,০০০**		
	উপ মোট			**১৪৫,০০০**		
	সর্বমোট			**৬৩২,৫০০**		

* উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-১৫, সংযুক্ত তহবিল — প্রাপ্তি , পৃ: ৩-৪. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

** পূর্ণ অঙ্কে হিসেব করা হয়েছে, দশমিকের পরের অংশ রাখা হয়নি। সে কারণে আমাদের হিসেবে মোট টাকার অঙ্ক ১৮২.৯৫৪ কোটি টাকা যা সরকারি নথীতে ১৮২.৯৫৩.১২৯৫ কোটি টাকা (দেখুন, ঐ পৃ: ৪)। 'বিবরণ' কলামের বামে যে সকল উৎসে "প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড" উল্লেখ নেই সেগুলি সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব।

*** ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকারি বাজেটে "সেচ বাবদ প্রাপ্তি" দেখানো হয়েছে ১৩,০০০ টাকা মাত্র যা: মোট রাজস্ব প্রাপ্তির নগণ্য শতাংশ মাত্র।

সারণি ২: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ব্যয়ের বাজেট

মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও খাতওয়ারী অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	অনুন্নয়ন					উন্নয়ন					উন্নয়ন + অনুন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০১৪-১৫ (সরকার প্রস্তাবিত)		২০১৫-১৬ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৪-১৫ সরকার প্রস্তাবিত		২০১৫-১৬ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৪-১৫ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০১৫-১৬ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
০১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১৫	০.০০	২০	০.০১	১.৩৩	০	০.০০	-	০.০০	-	১৫	২০	১.৩৩
০২	জাতীয় সংসদ	১৯৭	০.০৬	২০০	০.০৯	১.০২	২৩	০.০৩	৫০	০.০১	২.১৭	২২০	২৫০	১.১৪
০৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩১৬	০.১০	৩০০	০.১৩	০.৯৫	৪৪৬	০.৫৫	৫০০	০.১২	১.১২	৭৬২	৮০০	১.০৫
০৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩২	০.০১	৭৫	০.০৩	২.৩৪	১১	০.০১	১৩	০.০০	১.১৮	৪৩	৮৮	২.০৫
০৬	নির্বাচন কমিশন	২১৫	০.০৬	২,০০০	০.৯০	৯.৩০	৫১৩	০.৬৩	১,০০০	০.২৪	১.৯৫	৭২৮	৩,০০০	৪.১২
০৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১,১৭১	০.৩৫	২,০০০	০.৯০	১.৭১	১২৯	০.১৬	১৫০	০.০৪	১.১৬	১৩০০	২,১৫০	১.৬৫
০৮	সরকারি কর্ম কমিশন	৩১	০.০১	১০০	০.০৪	৩.২৩	০	০.০০	৫০	০.০১		৩১	১৫০	৪.৮৪
০৯	অর্থ বিভাগ(ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত)	৩০,০০৩	১৭.০৪	৩০,০০০	১৩.৪৭	১.০০	২৬০	০.৩২	৫০০	০.১২	১.৯২	৩০,২৬৩	৩০,৫০০	১.০১
	নিয়ন্ত্রণ মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন (বিএসইসি, আইডিআরএ, পুঁজি বাজার ইত্যাদি)								৫০০	০.১২			৫০০	
১১	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১,২৫৬	০.৩৮	২,৫০০	১.১২	১.৯৯	৪৩৮	০.৫৪	৪৫০	০.১১	১.০৩	১৬৯৪	২,৯৫০	১.৭৪
১২	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৭৪০	০.২২	৫০০	০.২২	০.৬৮	৩৩	০.০৪	৫০	০.০১	১.৫২	৭৭৩	৫৫০	০.৭১
১৩	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১০২১৭	৩.০৮	১২৫	০.০৬	০.০১	৪০	০.০৫	৫০	০.০১	১.২৫	১০২৫৭	১৭৫	০.০২
১৪	পরিকল্পনা বিভাগ	৫৭	০.০২	৫০০	০.২২	৮.৭৭	১,৫৬৯	১.৯২	২,০০০	০.৪৯	১.২৭	১৬২৬	২,৫০০	১.৫৪
১৫	বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৬	০.০০	১৫০	০.০৭	৯.৩৮	১০৭	০.১৩	২৫০	০.০৬	২.৩৪	১২৩	৪০০	৩.২৫
১৬	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৭০	০.০৫	৩০০	০.১৩	১.৭৬	২১২	০.২৬	৩০০	০.০৭	১.৪২	৩৮২	৬০০	১.৫৭
১৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭৩৭	০.২২	১,০০০	০.৪৫	১.৩৬	১০০	০.১২	১৫০	০.০৪	১.৫০	৮৩৭	১,১৫০	১.৩৭
	কর ন্যায়পালের অফিস	০	০.০০	৫০	০.০২	০.০০	-	০.০০	৫০	০.০১	-	-	১০০	-
৩৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২,০০১	০.৬০	৩,০০০	১.৩৫	১.৫০	১৩,৪৬৭	১৬.৪৬	১৬,০০০	৩.৯০	১.১৯	১৫৪৬৮	১৯,০০০	১.২৩
	নগর উন্নয়ন	০	০.০০	০	০.০০	০.০০		০.০০	২,৪০২	০.৫৯	-	০	২,৪০২	-
৩৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৩৩০	০.১০	১,৫০০	০.৬৭	৪.৫৫	১,১৮৭	১.৪৫	৪,০০০	০.৯৮	৩.৩৭	১৫১৭	৫,৫০০	৩.৬৩
৫৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫৯	০.০৮	১,০০০	০.৪৫	৩.৮৬	৪৭৬	০.৫৮	১,৫০০	০.৩৭	৩.১৫	৭৩৫	২,৫০০	৩.৪০
১৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সেবার সুরক্ষা সহ)	১৬,২৬৯	৪.৯১	১৮,০০০	৮.০৮	১.১১	২২২	০.২৭	২৫০	০.০৬	১.১৩	১৬৪৯১	১৮,২৫০	১.১১
২০	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২২	০.০১	৫০	০.০২	২.২৭	০	০.০০	-	-	-	২২	৫০	২.২৭
২১	আইন ও বিচার বিভাগ	৬৭০	০.২০	১,২০০	০.৫৪	১.৭৯	৩৪০	০.৪২	৫০০	০.১২	১.৪৭	১০১০	১,৭০০	১.৬৮
৬১	সুপ্রিম কোর্ট	১০১	০.০৩	৫০০	০.২২	৪.৯৫	১৩	০.০২	৫০	০.০১	৩.৮৫	১১৪	৫৫০	৪.৮২
২২	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১০,৪৬৭	৩.১৬	১৫,০০০	৬.৭৪	১.৪৩	৯০৩	১.১০	২,৫০০	০.৬১	২.৭৭	১১৩৭০	১৭,৫০০	১.৫৪
৬৭	দুর্নীতি দমন কমিশন	৫৭	০.০২	১০০	০.০৪	১.৭৫	২	০.০০	৫০	০.০১	২৫.০০	৫৯	১৫০	২.৫৪
২৩	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১৩	০.০০	১০০	০.০৪	৭.৬৯	৯	০.০১	১৫	০.০০	১.৬৭	২২	১১৫	৫.২৩
২৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭,৮৯৮	২.৩৮	১৫,০০০	৬.৭৪	১.৯০	৫,৭৭৮	৭.০৬	১৪,০০০	৩.৪২	২.৪২	১৩৬৭৬	২৯,০০০	২.১২
২৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (এসএসসি, এইচএসসি, উচ্চতর, বৃত্তিমূলক ও ধর্মীয়)	১১,৯০৩	৩.৫৯	১৫,০০০	৬.৭৪	১.২৬	৩,৬৪৭	৪.৪৬	২১,০০০	৫.১২	৫.৭৬	১৫৫৫০	৩৬,০০০	২.৩২
২৬	বিজ্ঞান, ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২২৩	০.০৭	৫০০	০.২২	২.২৪	২,৩০৫	২.৮২	১০,০০০	২.৪৪	৪.৩৪	২৫২৮	১০,৫০০	৪.১৫
২৮	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৪৮	০.০৪	১,০০০	০.৪৫	৬.৭৬	৮৮০	১.০৮	১০,০০০	২.৪৪	১১.৩৬	১০২৮	১১,০০০	১০.৭০
২৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬,৮২৭	২.০৬	১০,০০০	৪.৪৯	১.৪৬	৪,৩৪৯	৫.৩২	৩৫,০০০	৮.৫৪	৮.০৫	১১১৭৬	৪৫,০০০	৪.০৩

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	অনুন্নয়ন					উন্নয়ন					উন্নয়ন + অনুন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০১৪-১৫ (সরকার প্রস্তাবিত)		২০১৫-১৬ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৪-১৫ সরকার প্রস্তাবিত		২০১৫-১৬ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৪-১৫ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০১৫-১৬ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
২৯	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২,৭১৪	০.৮২	৩,০০০	১.৩৫	১.১১	১৯১	০.২৩	১০,০০০	২.৪৪	৫২.৩৬	২৯০৫	১৩,০০০	৪.৪৮
৩০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৩৮১	০.৪২	৪,০০০	১.৮০	২.৯০	২০০	০.২৪	২০,০০০	৪.৮৮	১০০.০০	১৫৮১	২৪,০০০	১৫.১৮
৬৩	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৪৩৩	০.৪৩	২,০০০	০.৯০	১.৪০	৩১০	০.৩৮	৩,০০০	০.৭৩	৯.৬৮	১৭৪৩	৫,০০০	২.৮৭
৪৮	খাদ্য বিভাগ	১০,৫৬৭	৩.১৯	১	০.০০	০.০০	৫৮৪	০.৭১	১,০০০	০.২৪	১.৭১	১১১৫১	১,০০১	০.০৯
৪৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪,৮৬১	১.৪৭	১০,০০০	৪.৪৯	২.০৬	২,৪২৫	২.৯৬	৪,০০০	০.৯৮	১.৬৫	৭২৮৬	১৪,০০০	১.৯২
৩২	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৯৮৬	০.৩০	১,৫০০	০.৬৭	১.৫২	১,০৭৩	১.৩১	৩,০০০	০.৭৩	২.৮০	২০৫৯	৪,৫০০	২.১৯
৩৩	তথ্য মন্ত্রণালয়	৪৭৩	০.১৪	১,০০০	০.৪৫	২.১১	১১৯	০.১৫	৫০০	০.১২	৪.২০	৫৯২	১,৫০০	২.৫৩
৩৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬০	০.০৫	৫০০	০.২২	৩.১৩	৯৮	০.১২	২,০০০	০.৪৯	২০.৪১	২৫৮	২,৫০০	৯.৬৯
৩৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬৪	০.০৫	৫০০	০.২২	৩.০৫	১৮৩	০.২২	৫,০০০	১.২২	২৭.৩২	৩৪৭	৫,৫০০	১৫.৮৫
৩৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪৯০	০.১৫	১,০০০	০.৪৫	২.০৪	৩০৫	০.৩৭	৫,০০০	১.২২	১৬.৩৯	৭৯৫	৬,০০০	৭.৫৫
৪২	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩৩	০.০১	১০০	০.০৪	৩.০৩	২,২২৩	২.৭২	৩০,০০০	৭.৩২	১৩.৫০	২২৫৬	৩০,১০০	১৩.৩৪
৫৬	বিদ্যুত বিভাগ	১১	০.০০	১০০	০.০৪	৯.০৯	৯২৭৩	১১.৩৪	৫,০০০	১.২২	০.৫৪	৯২৮৪	৫,১০০	০.৫৫
	বিদ্যুত উৎপাদন	০	০.০০	০	০.০০	০.০০		০.০০	২৫,০০০	৬.১০	-	০	২৫,০০০	-
	বিদ্যুত সঞ্চালন	০	০.০০	০	০.০০	০.০০		০.০০	১৫,০০০	৩.৬৬	-	০	১৫,০০০	-
	বিদ্যুত বিতরণ	০	০.০০	০	০.০০	০.০০		০.০০	১৫,০০০	৩.৬৬	-	০	১৫,০০০	-
৪৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	১০,৮৭২	৩.২৮	১৫,০০০	৬.৭৪	১.৩৮	১,৫২৪	১.৮৬	১০,০০০	২.৪৪	৬.৫৬	১২৩৯৬	২৫,০০০	২.০২
৪৪	মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৪৩	০.১৯	১,৫০০	০.৬৭	২.৩৩	৭০২	০.৮৬	৭,০০০	১.৭১	৯.৯৭	১৩৪৫	৮,৫০০	৬.৩২
৪৫	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪৯৯	০.১৫	১,৫০০	০.৬৭	৩.০১	৪১৩	০.৫০	৩,০০০	০.৭৩	৭.২৬	৯১২	৪,৫০০	৪.৯৩
৪৬	ভূমি মন্ত্রণালয়	৬৭১	০.২০	১,৫০০	০.৬৭	২.২৪	১৬৩	০.২০	৫০০	০.১২	৩.০৭	৮৩৪	২,০০০	২.৪০
৪৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৮৮	০.২৪	১,২০০	০.৫৪	১.৫২	২,৮৩১	৩.৪৬	১০,০০০	২.৪৪	৩.৫৩	৩৬১৯	১১,২০০	৩.০৯
৩৯	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৭৪	০.০৫	৫০০	০.২২	২.৮৭	১,৫৬১	১.৯১	১০,০০০	২.৪৪	৬.৪১	১৭৩৫	১০,৫০০	৬.০৫
	তৈরী পোষাক	০	০.০০	০	০.০০	০.০০		০.০০	৫,০০০	১.২২	-	০	৫,০০০	-
৪১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২৭৯	০.০৮	৫০০	০.২২	১.৭৯	১৭৭	০.২২	১০,০০০	২.৪৪	৫৬.৫০	৪৫৬	১০,৫০০	২৩.০৩
১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১১৪	০.০৩	৫০০	০.২২	৪.৩৯	১২৮	০.১৬	৫০০	০.১২	৩.৯১	২৪২	১,০০০	৪.১৩
৩১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭২	০.০২	৫০০	০.২২	৬.৯৪	৭৬	০.০৯	৫০০	০.১২	৬.৫৮	১৪৮	১,০০০	৬.৭৬
৬৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৬০	০.০৫	২,০০০	০.৯০	১২.৫০	৩৩৭	০.৪১	১,৫০০	০.৩৭	৪.৪৫	৪৯৭	৩,৫০০	৭.০৪
৫০	সড়ক বিভাগ	২,২৫৭	০.৬৮	৪,০০০	১.৮০	১.৭৭	৪,৬০৮	৫.৬৩	২০,০০০	৪.৮৮	৪.৩৪	৬৮৬৫	২৪,০০০	৩.৫০
৭১	সেতু বিভাগ	২	০.০০	৫০০	০.২২	২৫০.০০	৮,৭৩৫	১০.৬৮	১৫,০০০	৩.৬৬	১.৭২	৮৭৩৭	১৫,৫০০	১.৭৭
৫১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১,৯৭৮	০.৬০	৫,০০০	২.২৫	২.৫৩	৪,৪৮৫	৫.৪৮	২০,০০০	৪.৮৮	৪.৪৬	৬৪৬৩	২৫,০০০	৩.৮৭
৫২	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	২৪৮	০.০৭	৪,০০০	১.৮০	১৬.১৩	৭৭৫	০.৯৫	২০,০০০	৪.৮৮	২৫.৮১	১০২৩	২৪,০০০	২৩.৪৬
৫৩	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫১	০.০২	৫০০	০.২২	৯.৮০	১০৯	০.১৩	৫,০০০	১.২২	৪৫.৮৭	১৬০	৫,৫০০	৩৪.৩৮
৫৪	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৫৫১	০.১৭	১,৫০০	০.৬৭	২.৭২	৭৪১	০.৯১	৫,০০০	১.২২	৬.৭৫	১২৯২	৬,৫০০	৫.০৩
	অভ্যন্তরীণ (সুদ)	২৯,৩০৫	৮.৮৪	৩৫,০০০	১৫.৭২	১.১৯	০	০.০০	-	-	-	২৯৩০৫	৩৫,০০০	১.১৯
	বৈদেশিক (সুদ)	১,৭৩৮	০.৫২	২,০০০	০.৯০	১.১৫	০	০.০০	-	-	-	১৭৩৮	২,০০০	১.১৫
	মোট	১৭৬,০৩৬	১০০	২২২,৬৭১	১০০	১.২৬	৮১,৮০৮	১০০	৪০৯,৮৩০	১০০	৫.০১	২৫৭,৮৪৪	৬৩২,৫০১	২.৪৫

* উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-১৫, মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন), পৃ: ণ - য. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদের বাজেট প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের মোট রাজস্ব আয় হবে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২.৬৮ গুণ বেশী। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এ বৃদ্ধি হবে প্রধানত তিনটি কারণে : (১) আয়ের বিভিন্ন উৎসে যৌক্তিক বৃদ্ধি, যেমন আয় ও মুনাফার উপরে কর, আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, জরিমানা-দন্ড-বাজেয়াপ্তকরণ, টোল ও লেভী, সরকারের সম্পদ বিক্রয়। বিভিন্ন উৎসে এ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ থেকে প্রায় ৬৫ গুণ পর্যন্ত যেমন মাদক শুল্ক; সারণি ১ দেখুন; (২) কোন কোন উৎসের ক্ষেত্রে কর হার পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র কর আদায় প্রক্রিয়া জোরদার করে, যেমন মূল্য সংযোজন কর, আবগারী শুল্ক, (৩) প্রস্তাবিত নতুন উৎসসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি। (এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন সারণি ১)

এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, আমরা সরকারের মোট রাজস্ব প্রাপ্তির যে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার হিসেব দিয়েছি 'আদর্শ' পরিমাণটা হতে পরে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। কারণ কর ও কর বহির্ভূত অনেক উৎস আছে যে সবে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সাধারণভাবে যা মনে করা হয় প্রকৃত সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি। যেমন আয় ও মুনাফার উপর কর। আয় কর ফাঁকি নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার; উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আসলে নির্দ্ধারিত আয়কর দেন না; দেশে মাত্র ৪৬ জন ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা অথবা তার বেশি কর দেন যেখানে এ সংখ্যাটি হবার কথা কমপক্ষে ৫০ হাজার জন ব্যক্তি; রেন্ট সিকাররা বিপুল পরিমাণে কর ফাঁকি দিতে হেন কাজ নেই যা করেন না। আবার কালো টাকার মালিকরা তো তেমন কোন করই দেন না, কারণ কালো টাকার উপর কি ভাবে কর দেবেন? কালো টাকা যদি বৈধ আয়ই না হয়ে থাকে তাহলে আয়ের উপর কর অর্থাৎ আয় কর কি ভাবে দেবেন, কোথায় দেবেন? আবার কালো টাকা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করলে তো সহজেই সরকারের রাজস্ব আয়ের "কর ব্যতীত প্রাপ্তি" খাত থেকে রাজস্ব আহরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বৃদ্ধি পাবে। আবার জমি সম্পত্তি অথবা ফ্ল্যাট যে দামে রেজিস্ট্রি করা হয় তার আসলে যে মূল্য পরিশোধ করা হয় সে ফারাক উদ্ভূত রাজস্ব কোথায়? এসই 'ওপেন সিক্রেট'। শর্ষের মধ্যেয় এসব ভূত নিয়ে ভূত-ভবিষ্যতে ভাবনা জরুরি।

আমাদের বিকল্প বাজেটে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট মিলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য মোট ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রস্তাব করেছি যা গত বছরের বাজেটের তুলানায় ২.৪ গুণ বেশি(গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট বাজেটের আকার ছিল ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা)। আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের আকারই শুধু তুলনামুলক বড় নয় সেই সাথে কাঠামোগত বড় পরিবর্তন যেক্ষেত্রে ঘটেছে তা হল মোট বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের হিস্যা। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে যেখানে উন্নয়ন : অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত ছিল ৩১:৬৯ সেখানে আমাদের প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ বাজেটে উন্নয়ন: অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ

অনুপাত হবে ৬৫:৩৫। অর্থাৎ সহজ কথায় আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ কাঠামো উন্নয়নমুখী।

এ বরাদ্দ শুধু উন্নয়মুখী বলাই যথেষ্ট নয়। খাতওয়ারি বরাদ্দ কাঠামো যা তাতে বলতেই হবে যে প্রস্তাবিত বরাদ্দ কাঠামো দারিদ্র্য-বৈষম্য নিরসনমুখী, উৎপাদনমুখী, উপাদনশীলতা বৃদ্ধিমুখী, শিল্পায়নমুখী, কৃষির বিকাশমুখী, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমুখী ও মানব সম্পদ ও মানবপুঁজি সৃষ্টি ও তার বিকাশ ত্বরান্বয়নমুখী। এসব উপসংহারে উপনিত হবার কারণ অনেক যার মধ্যে অন্যতম হল নিম্নরূপ: (১) ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যেখানে মোট বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ৩ গুণ সেখানে একই সময়ে উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ৫ গুণ আর অনুন্নয়ন বাজেট ১.২৬ গুণ, (২) ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাতওয়ারি প্রস্তাবিত বরাদ্দ অধিকতরও প্রগতিমুখী। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অগ্রধিকারক্রম ভিত্তিতে খাতওয়ারি সর্ব্বোর্চ বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি বিদ্যুৎসহ ভৌত অবকাঠামো খাতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫-এর তুলনায় ৩.৬৬ গুণ বেশি, তারপরে যথাক্রমে আছে শিক্ষায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা (২০১৪-১৫ এর তুলনায় ২.২গুণ বেশি), স্বাস্থ্য খাতে ৪৫ হাজার কোটি টাকা (২০১৪-১৫-এর তুলনায় ৪ গুণ বেশি), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদে ৩০ হাজার ১০০ কোটি টাকা (২০১৪-১৫-এর তুলনায় ১৩ গুণ বেশি), কৃষিতে ২৫ হাজার কোটি টাকা (২০১৪-১৫-এর তুলনায় ২ গুণ বেশি), মহিলা ও শিশু খাতে ২৩ হাজার কোটি টাকা (২০১৪-১৫-এর তুলনায় প্রায় ১৫ গুণ বেশি), প্রতিরক্ষায় ১৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকা (২০১৪-১৫-এর তুলনায় ১.১ গুণ বেশি), আইন-শৃংখলায় ১৫ হাজার কোটি টাকা (২০১৪-১৫ এর তুলনায় ১.৩ গুণ বেশি), সমাজকল্যাণে ১৩ হাজার কোটি টাকা (২০১৪-১৫ এর তুলনায় ৪.৫ গুণ বেশি), পানি সম্পদে ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকা (২০১৪-১৫ এর তুলনায় ৩ গুণ বেশি), শিল্পে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (২০১৪-১৫ এর তুলনায় ৬ গুণ বেশি), বস্ত্র ও পাট খাতে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (২০১৪-১৫ এর তুলনায় ২৩ গুণ বেশি)। (বিস্তারিত দেখুন সারণি-১)।

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৫-১৬" একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দলিল। মৌলিক রূপান্তরমূখী এ দলিল বাস্তবায়নে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা ও দৃঢ় অঙ্গিকার। অর্ন্তনিহিত মর্মবস্তুসহ এ দলিল আপাতত: গৃহিত হবে কি হবে না, বাস্তবায়িত হবে কি হবে না এ প্রসঙ্গ ভবিষ্যতের। আমাদের লক্ষ্য ছিল সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করা। তা পথনির্দেশ করা।

একনজরে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাব		
বিবরণ	সরকারের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট
মোট বাজেট (কোটি টাকায়) অনুন্নয়ন (কোটি টাকায়) উন্নয়ন (কোটি টাকায়)	২৬৪,৪৪৭ ১২৮,৭২২ ৮১,৪৯৩	৬৩২,৫০০ ২২২,৬৭০ ৪০৯,৮৩০
উন্নয়ন- অনুন্নয়ন বাজেট অনুপাত	৩১:৬৯	৬৫:৩৫
মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) (কোটি টাকায়)	১৮২,৯৫৪	৪৮৭,৫০০
রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর অনুপাত (শতাংশ)	৩৪:৬৬	৪৩:৫৭
রাজস্ব আয়ের প্রধান খাত সমূহ (মোট অর্থের নিরিখে)	আয় ও মুনাফার উপর কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক কর, আমদানি শুল্ক, কর ব্যতিত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	আয় ও মুনাফার উপর কর, মূল্য সংযোজন কর, লভ্যাংশ ও মুনাফা, সম্পদ কর, সম্পূরক কর, আমদানি শুল্ক, কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি, যানবাহন কর
বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাতসমূহ (মোট বরাদ্দের পরিমাণের নিরিখে)	অবকাঠামো (বিদ্যুৎসহ), শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, কৃষি, প্রতিরক্ষা, আইন-শৃংখলা, স্বাস্থ্য	অবকাঠামো (বিদ্যুৎসহ), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি-খনিজ, কৃষি, নারী ও শিশু, প্রতিরক্ষা
রাজস্ব আয়ে নতুন খাত/উৎসের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	১১টি
বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা	আছে	নেই
অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা	সীমিত	উল্লেখযোগ্য (সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)
আর্থ-সামাজিক বৈষম্য-অসমতা নিরসন দর্শন	প্রান্তিকভাবে উপস্থিত	মূল লক্ষ্য

৭। আমাদের উপসংহারিক বক্তব্য

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে ভৌগলিক স্থানান্তর ঘটছে যার ভিত্তিতে আছে বড় আকারের মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-এর প্রাপ্যতা। সামনের ২০/২৫ বছরে আমরাও পারি বিশ্ব অর্থনীতিতে উচ্চ আসনে আসিন হতে। বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে আমাদের এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রয়োজন মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্ভাসিত গভীর অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব এবং সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যে নেতৃত্ব এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় "সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা"-কে সর্ব্বোচ অগ্রধিকার ভিত্তিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবে। আর এ সব সম্পদের মধ্যে আছে (১) মানব সম্পদ– যেখানে জন-সংখ্যাকে জন-সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষায়, জনস্বাস্থ্যে, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট খাত-ক্ষেত্রে, (২) ভৌত সম্পদ– সব ধরণের ভৌত অবকাঠামো : বিদ্যুৎ-জ্বালানি, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভাট ইত্যাদি, এবং (৩) প্রাকৃতিক সম্পদ– জমি-জলা-জঙ্গলসহ গ্যাস-তেল-কয়লা-বঙ্গোপসাগর-আকাশ-মহাকাশ। এ সব সম্পদের সমন্বিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ফলপ্রদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়োগিক ভাবনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা ফলপ্রদতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যত উন্নয়ন-বিকাশ-প্রগতি নিয়ে নূতন এ দর্শন চিন্তার বিকল্প নেই। এ দর্শন চিন্তাটিও আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

আগামি পাঁচ বছরে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ-এর স্বপ্ন দেখছি। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ। এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন দলিল হতে হবে "দেশের মাটি থেকে উত্থিত বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শন ভিত্তিক" দলিল। "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৫-১৬" শীর্ষক দলিলটি এধরণের একটি কাঠামো। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ যারা বিনির্মাণ করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যাইই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে **প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, তরুন প্রজম্মকে আত্মবিশ্বাসী ও আলোকিতকরণের, নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের।**

দেশের মাটি উত্থিত এ দর্শনটি বাস্তবায়নে নিঃসন্দেহে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে– তা হলো রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্তদের হাত থেকে সরকার ও রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে; সে অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যখন রেন্টসিকাররাই সরকার ও রাজনীতির অধীনস্থ সত্ত্বায় রূপান্তরিত হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উল্লিখিত বিশ্বাসসমূহ অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, মানবিক যে কোনো মানদণ্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল চেতনা-ভিত্তি।